Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতা-মাতা ও সন্তান পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

Mawa Akter

রোলঃ 23100120002

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতা-মাতা ও সন্তান পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

Mawa Akter

রোলঃ 23100120002

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " পিতা-মাতা ও সন্তান পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে Mawa Akter, আইডিঃ 23100120002 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " পিতা-মাতা ও সন্তান পরস্পরের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মাহবুবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

মাওয়া আক্তার

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Mawa Akter

আইডিঃ 23100120002

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 6

১ম অধ্যায় 8

পিতা-মাতার মর্যাদা..8

মাতা-পিতার গুরুত্ব..12

পিতা-মাতার সেবা করার ফযীলত..14

পিতা-মাতার অর্থনৈতিক অধিকার..22

পিতা-মাতার মৃত্যুর পরে সন্তানের করণীয় 25

পিতা-মাতাকে গালি দেওয়া: 36

পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া:...37

পিতা-মাতাকে অস্বীকার করা: 39

পিতা-মাতার সাথে খারাপ আচরনের দুনিয়াবি পরিণতি...41

পিতামাতার সাথে খারাপ আচরনের পরকালের পরিণতি:...46

পিতা-মাতার প্রতিদান: 48

পিতা-মাতার মাঝে দ্বন্দ্ব লাগলে সন্তানের করণীয়:...51

২য় অধ্যায় 54

মা-বাবার সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক:...54

সন্তান পরিচর্যার ক্ষেত্র..54

সন্তানের অধিকার...56

সন্তানের কদর ও মূল্য...57

সন্তানের প্রতিপালন 59

সুন্দর আচরণ...79

ভালো নাম রাখা 81

সন্তানের প্রতি স্নেহ ও ভালোবাসা...83

তালকীন বা দীক্ষা:..87

সন্তানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ...90

সন্তানের বিয়ে 93

শিশুর আনুগত্য ও অনুসরণ:...97

সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যত...99

উপসংহার 103

ভূমিকা

মানবজনমের প্রাকৃতিক আবির্ভাব ঘটে পিতামাতার মাধ্যমে। নবজাতক সন্তানকে সাদরে পৃথিবীর আলো-বাতাসের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেন পিতামাতাই। জগতের নানা ঘাত-প্রতিঘাত থেকে সযত্নে আগলে রেখে সন্তানের নিরাপদভাবে বেড়ে ওঠার মূল কারিগর পিতামাতা। জগত সংসারের চিরায়ত মায়াবন্ধনে তাই পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যকার সম্পর্কই সর্বাধিক গভীরতাময়, তাৎপর্যপূর্ণ ও অর্থবহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই অকৃত্রিম বন্ধনকে এতই মর্যাদা দান করেছেন যে, আল্লাহর ইবাদতের পরই পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণকে স্থান দিয়েছেন। এমনকি পিতা-মাতা যদি মুশরিকও হয়, তদপুরি তাদের প্রতি অবাধ্যতা কিংবা অসম্মানসূচক আচরণ করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। ইসলামের এই অনন্য দিক-নির্দেশনা পিতা-মাতার মর্যাদা ও অবস্থানকে সর্বোচ্চ সীমায় উন্নীত করেছে।

ইসলামী সমাজ বিপ্লব সাধনের প্রচেষ্টা চালানো প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরয। এ দায়িত্ব পালন শুরু হয় পারিবারিক জীবন থেকে।

সন্তান যেমন পিতা-মাতার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ উপহার, তেমনি পিতা-মাতা সন্তানের জন্য দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ নে'মত। দু'জন বিশ্বস্ত মানুষ বহুবিধ পরিশ্রমের মাধ্যমে অন্য একজন মানুষকে তিলে-তিলে বড় করে তোলে।

যার জন্য এত ত্যাগ, কষ্ট ও এত ভালোবাসা, সে হল সন্তান। আর অপর দু'জন নিঃস্বার্থ মানুষের পরিচয় পিতা ও মাতা। গর্ভ থেকে শুরু করে মা যেমন আপন সন্তানকে বহু কষ্ট ও ত্যাগ-তিতীক্ষার মাধ্যমে ধীরে-ধীরে বড় করে তুলতে সাহায্য করেন, তেমনি পিতাও সর্বোচ্চ শ্রম ঢেলে স্ত্রী-সন্তানের যাবতীয় ভরণ-পোষণ নির্বাহের কঠিন দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন।

সেজন্য পৃথিবীতে সন্তানের নিকট পিতা-মাতার সম্মান ও মর্যাদা সবার উপরে। মহান আল্লাহ সমগ্র বিশ্ববাসীর একমাত্র উপাস্য ও অভিভাবক, আর পিতা-মাতা হ'লেন সন্তানদের ইহকালীন জীবনের অভিভাবক। সুতরাং সন্ত ানদের কাজ হ'ল আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় হুকুম-আহকাম পালনের সাথে সাথে পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করা। জন্মের পর থেকে শুরু করে কৈশোর পর্যন্ত সন্তান

পিতা-মাতার তত্ত্বাবধানেই থাকে এবং সম্পূর্ণ অনুগত থাকে। অতঃপর যৌবনে বা সংসার জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে পিতা-মাতার সঙ্গে তার সন্তানদের মতপার্থক্য দেখা দিতে পারে, এটা স্বাভাবিক। সেজন্য মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতার সঙ্গে তার সন্তানদের বাল্য জীবনের ভালবাসার ন্যায় সারা জীবন সুসম্পর্ক অটুট ও বহাল রাখার আদেশ দিয়েছেন।

পারিবারিক জীবনের কর্ণধার হলেন পিতা। অনেক সময় মাতাও। পরিবার যদি ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় তাহলে অনাবিল শান্তি অবধারিত। এ সুন্দর জীবন গড়ে তোলার জন্য মাতা-পিতার অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকার প্রয়োজন রয়েছে। ইসলামে মাতা-পিতার অধিকার যেমন স্বীকৃত তেমনি সন্তানের অধিকারও। মোটকথা, ইসলামে মাতা-পিতার অধিকার দানের সাথে সাথে কিছু কর্তব্যও নিরুপণ করা হয়েছে। তেমনি সন্তানের অধিকার প্রদানের সাথে সাথে অনেক দায়িত্বও অর্পণ করা হয়েছে। মাতা-পিতা এবং সন্তান যদি নিজেদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয় তাহলে কাঙ্ক্ষিত সুন্দর ও সুশৃঙ্খল পরিবার গড়ে উঠে। আর সুন্দর ও সুশৃঙ্খল পরিবার গড়ে উঠলে ইসলামী সমাজ বিপ্লব তরান্বিত হয়।

দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, ইসলাম পিতা-মাতার মর্যাদাকে এত উচ্চকিত করার পরও মুসলিম সমাজের বহু গৃহে পিতা-মাতারা নিগৃহীত জীবন-যাপন করছেন। বিশেষ করে যখন তারা বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হন কিংবা রোগ-শোকে জর্জরিত হয়ে পড়েন, তখন তারা একেবারেই অপাংক্তেয় হয়ে ওঠেন। এমনকি এমতবস্থায় সন্তানরা কখনও অত্যন্ত নির্মমভাবে তাদেরকে ঘরছাড়া করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন কিংবা বিধর্মী দেশগুলোর অনুকরণে প্রবীণ নিবাসে রেখে আসেন। ফলে এককালে যে সন্তানদেরকে তারা সর্বোচ্চ মমত্ব ও ভালোবাসা দিয়ে লালন-পালন করেছিলেন, সেই সন্তানদের হাতেই তারা চূড়ান্ত লাঞ্ছনার শিকার হন। শেষ জীবনটা তাদের কেটে যায় অব্যক্ত বেদনা আর হাহাকারের দীর্ঘশ্বাসে।

১ম অধ্যায়

পিতা-মাতার মর্যাদা

মানুষের প্রধানতম ফরয বা কর্তব্য হলো আল্লাহর উপর ঈমান আনয়ন এবং তার নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য বা বন্দেগী। এরপরই পারিবারিক কর্তব্য পালন শুরু হয়। এ সকল দায়িত্ব পালন এবং পারিবারিক জীবন সংশোধন ও পুনর্গঠনের চিন্তা করা এক দিক দিয়ে সামাজিকভাবে যেমন প্রয়োজন, তেমনি এটা একটা দীনী কর্তব্যও।
পারিবারিক জীবনের পর শুরু হয় বংশীয় জীবনের সীমা। এ জীবনে সবচেয়ে উঁচু স্থান এবং সবচেয়ে বড় অধিকার হলো মাতা-পিতার। মাতা-পিতার উঁচু মর্যাদা এবং অধিকারের গুরুত্ব পবিত্র কুরআনের বর্ণিত বর্ণনা ভঙ্গী থেকেই আঁচ করা যায়। পবিত্র কুরআনের স্থানে স্থানে আল্লাহর অধিকারের সাথে সাথে মাতা-পিতার অধিকারের কথা বর্ণনা করা হয়েছে এবং আল্লাহর শোকর গুজারির সাথে সাথে মাতা-পিতার শোকর গুজারির প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

মানব সৃষ্টির ইতিহাসে আদম ও হাওয়া ব্যতীত সকল সৃষ্টিই পিতা-মাতার মাধ্যমে পৃথিবীতে এসেছে। কেবল ঈসা (আঃ) পিতা ব্যতীত জন্মগ্রহণ করেছেন। তাই ইসলামী শরী'আতে পিতা-মাতাকে অপরিসীম মর্যাদা দান করা হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপনের পরে পরেই পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করাকে আবশ্যক করে দিয়েছেন। তাদের আদেশ-নিষেধ শরী'আত বিরোধী না হ'লে তা মেনে চলার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَا أَفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا -وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي

صغيرا- ً

'আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারু উপাসনা কর না এবং তোমরা পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা

উভয়ে যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হন, তাহ'লে তুমি তাদের প্রতি উহ্ শব্দটিও উচ্চারণ কর না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না। আর তাদের সাথে নরমভাবে কথা বল। আর তাদের প্রতি মমতাবশে নম্রতার বাহু অবনমিত কর এবং বল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি দয়া কর যেমন তারা আমাকে ছোটকালে দয়াবশে প্রতিপালন করেছিলেন' (বনী ইসরাঈল ১৭/২৩-২৪)।

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ স্বীয় ইবাদতের সাথে পিতা-মাতার সেবাকে একত্রিতভাবে বর্ণনা করেছেন। এর মাধ্যমে এটিকে তাওহীদ বিশ্বাসের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বুঝানো হয়েছে। এর কারণ সৃষ্টিকর্তা হিসাবে যেমন আল্লাহ্ কোন শরীক নেই, জন্মদাতা হিসাবে তেমনি পিতা-মাতারও কোন শরীক নেই। আল্লাহর ইবাদত যেমন বান্দার উপর অপরিহার্য, পিতা-মাতার সেবাও তেমনি সন্তানের উপর অপরিহার্য।' যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে, أَنِ

اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرِ 'অতএব তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (মনে রেখ, তোমার) প্রত্যাবর্তন আমার কাছেই' (লোকমান ৩১/১৪)। এখানেও আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতাকে সমভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

কুরআন হাকিমের এ দুটি আয়াত বার বার পাঠ করলে এবং এ সম্পর্কে চিন্তা করলে কতিপ্রয় জিনিস সুন্দরভাবে ধরা দেবে:

প্রথমত, মুমিনের উপর আল্লাহর পর সবচেয়ে বড় অধিকার হলো মাতা-পিতার। কুরআনে হাকিমে রবের একত্ববাদের পর সর্বপ্রথম নির্দেশে বলা হয়েছে যে, মাতা-পিতার সাথে ভালো ব্যবহার করো। অতপর এ তাকিদ একই ধরনের বর্ণনার মাধ্যমে কুরআনে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, মাতা-পিতা যখন বৃদ্ধ হয়ে যান তখন আবশ্যিকভাবে তাঁদের মেজাজে কিছুটা রুক্ষতা ও খিটখিটে ভাব সৃষ্টি হয় এবং বয়সের কারণে এমন সব কথাও তাঁদের দিক থেকে আসা শুরু হয় যা অনাকাঙ্ক্ষিত। মুসলমানদের উচিত, এ বার্ধক্যের বয়সে মাতা-পিতার রুক্ষ মেজাজের প্রতি দৃষ্টি রাখা, তাঁদের প্রতিটি কথা খুশীর সাথে সহ্য করা

এবং তাঁদের কোনো কথায় বিরক্ত হয়ে জবাবে উহ্ শব্দও না বলা এবং ধমকের সাথে কোনো কথার জবাব না দেয়া।

সন্তানদেরকে শৈশবকালের কথা স্মরণ করতে হবে। সে সময় তারা না বুঝে কত ধরনের অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন এবং নিরর্থক কথা বলে মাতা-পিতাকে পেরেশান করতো। কিন্তু মা-বাপ হাসিমুখে তাদের কথা শুনতেন, খুশী হতেন, স্নেহমাখা স্বরে জবাব দিতেন এবং কখনো বিরক্ত হতেন না।

তৃতীয়ত, মাতা-পিতার মান-মর্যাদার প্রতি সম্পূর্ণ সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। কথা-বার্তা বলার সময় তাঁদের ইজ্জতের প্রতি খেয়াল দিতে হবে। বয়সের শেষ পর্যায়ে যখন শক্তি রহিত হয়ে যায় তখন স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধ মাতা-পিতার মান-সম্মান প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং নিজের গুরুত্ব প্রকাশের জন্য বিভিন্ন ধরনের কথা বলে থাকেন। নিজের মত সম্পর্কে অহেতুক পীড়াপীড়ি করেন। বার বার গোস্বা করেন। বিভিন্নভাবে নিজের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। এ অবস্থায় পবিত্র কুরআনের নির্দেশাবলী হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। হাসি মুখে তাঁদের সেইসব কথা সইতে হবে এবং কোনো সময় বিরক্ত হয়ে এমন কথা উচ্চারণ করা যাবে না যা তাঁদের মান-সম্মানের পরিপন্থী হয়।

চতুর্থত, আচার-আচরণে তাঁদের সাথে বিনয় এবং নরম স্বভাবের হতে হবে। অনুগত হওয়ার সাথে সাথে তাঁদের সামনে মাথা নীচু রাখা আবশ্যক। তাঁদের সব নির্দেশ মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং তা পালন করে স্বস্তি অনুভব করতে হবে। বার্ধক্যে মাতা-পিতা যখন সন্তানের সব ধরনের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হন তখন এক অনুগত খাদেম হিসেবে তাঁদের খিদমত করা অত্যাবশ্যক। কিন্তু কোনো কথা ও কাজ থেকে যেন অহমিকা এবং ইহসান প্রকাশ না পায়। বরং সন্তানসুলভ সম্মান প্রদর্শনপূর্বক গৌরব অনুভব করা উচিত এবং এ খিদমতের সুযোগ লাভে আল্লাহর শোকর আদায় করা দরকার।

পঞ্চমত, মাতা-পিতাকে অসহায় ও দুর্বল বয়সে পেয়ে নিজের শৈশবের সেই সময়ের কথা স্মরণ করা দরকার, যখন শিশু অত্যন্ত দুর্বল, অসহায় ও মজবুর থাকে। তখন মাতা-পিতার কত স্নেহ ভালোবাসা এবং মনোযোগ দিয়ে শত ধরনের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে শিশুর লালন-পালন করেন। শিশুর আনন্দে আনন্দিত হন এবং তার কষ্ট দেখে অস্থির হয়ে পড়েন। শৈশবকালের অবস্থা স্মরণ করে মুহাব্বত ও রহমাতের আবেগে

অবলীলাক্রমে বার বার দোয়ার জন্য উঁচিয়ে বলতে থাকে, হে পরওয়াদিগার! যেমন শৈশবকালে স্নেহ ও মুহাব্বতের সাথে তাঁরা জান-প্রাণ দিয়ে আমাদের লালন-পালন করেছিলেন, তুমিও তাঁদের প্রতি রহম করো ও তাঁদের মুশকিল আসান করে দও

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِير.

আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট স্বীকার করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে। নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে' (লোকুমান ৩১/১৪)।

পবিত্র কুরআনের বাণীগুলোকে পরম শ্রদ্ধা ও বিনয়াবনত হৃদয়ে মূল্যায়ন করতে হবে। এখানে মানুষকে আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতের প্রতি অবিচল থাকা ও সাথে সাথে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার, তাদের সেবা-যত্ন ও আনুগত্যের নির্দেশও দান করা হয়েছে। আয়াতের প্রারম্ভেই পিতা-মাতা উভয়ের সাথে সদ্ব্যবহারের আদেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু পরক্ষণেই মাতার কষ্টের কথা উল্লেখ করে তাদের আনুগত্যের যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়েছে। অতঃপর সকল আত্মীয়-স্বজন, আপনজন ও সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বাগ্রে পিতা-মাতার হক সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়েছে।

মাতা-পিতার গুরুত্ব

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقَّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا ؟ قَالَ هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ ابن ماجه، مشكوة

"হযরত আবি উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সন্তানের উপর মাতা-পিতার কি অধিকার রয়েছে? তিনি ইরশাদ করলেন, মাতা-পিতা তোমাদের বেহেশত এবং দোযখ।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ ইরশাদের মর্মার্থ হলো, কোনো ব্যক্তি তাঁদের থেকে মুখাপেক্ষীহীন হতে পারবে না। সামাজিক জীবনে তাঁদের গুরুত্ব ছাড়াও পরকালীন জীবনের মুক্তি ও সাফল্যের দিক থেকেও তাঁদের গুরুত্ব অপরিসীম। তাঁদের সাথে সুন্দর ব্যবহার ও আনুগত্য করে এবং সন্তুষ্ট রেখে সন্তান জান্নাতে নিজের ঘর তৈরি করতে পারে। অন্যদিকে তাঁদের অধিকার পদদলিত করে অসন্তুষ্টির কারণে জাহান্নামের ইন্ধনও হতে পারে।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رِضا الله فِي رِضا الْوَالِدِ وَسُخْطُ اللَّهِ فِي سُخْطِ الْوَالِد- ِ

"হযরত আবদিল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত রয়েছে।"

মাতা-পিতার অধিকার অস্বীকার করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় না। যারা তাঁদেরকে সন্তুষ্ট রাখতে পারে তারাই আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে পারে। তাঁদের ক্রোধ-উদ্রেককারীরা আল্লাহর গযব থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে না এবং যারা তাঁদেরকে অসন্তুষ্ট করবে তারা আল্লাহকেও অসন্তুষ্ট করবে।

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ص أَرَدَتْ أَنْ أَغْزُوَ، وَقَدْ جِئْتُ اسْتَشِيرُكَ ؟ فَقَالَ هَلْ لَكَ

مِنْ أُمٍّ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَالْزَمَهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا - ابن ماجه، نسائ

হযরত জাহিমার রাদিয়াল্লাহু আনহু পুত্র হযরত মাবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, হযরত জাহিমা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করাই আমার ইচ্ছা। আর এজন্য আপনার সাথে পরামর্শ করতে এসেছি। বলুন এ ব্যাপারে আপনার নির্দেশ কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মাতা কি জীবিত আছেন?

জাহিমা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, জ্বী হ্যাঁ। আল্লাহর শোকর যে, তিনি জীবিত আছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, তুমি ফিরে যাও এবং তাঁর খিদমতেই লেগে থাকো। কেননা, তাঁর পায়ের তলাতেই বেহেশত।"

"তাঁর পায়ের তলায় বেহেশত" কথাটি ব্যাপক অর্থে বর্ণনা করা হয়েছে। যার অর্থ হলো, তাঁকে পুরোপুরি সম্মান এবং আচার-আচরণে অত্যন্ত বিনয় দেখাতে হবে। মন-প্রাণ দিয়ে তাঁর খিদমত ও খিদমতকেই নিজের মুক্তির মাধ্যম মনে করতে হবে।

উপরের হাদীসে পিতার অনুগত হওয়ার প্রতি গুরুত্ব প্রদান এবং এ হাদীসে মাতার আনুগত্য ও খিদমতের গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। এ হাদীস তিবরণীতে মাতা ও পিতা উভয়ের কথা উল্লেখ করে বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত জাহিমা রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বয়ং বলেছেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির হলাম এবং আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জিহাদে অংশগ্রহণ করাই আমার ইচ্ছা। এ ব্যাপারে আমি আপনার মত জানতে চাই। তিনি ইরশাদ করলেন, তোমার মাতা-পিতা (জীবিত) আছেন? আমি আরজ করলাম, জ্বী হাঁ। আল্লাহর শোকর, উভয়েই জীবিত আছেন। তিনি ইরশাদ করলেন, যাও, তাঁদের খিদমতেই লেগে থাকো। কেননা, তাঁদের পায়ের নীচেই বেহেশত রয়েছে।

পিতা-মাতার সেবা করার ফযীলত

পিতা-মাতার সেবা করা জিহাদ অপেক্ষা উত্তম:

দ্বীন রক্ষার জন্য অনেক সময় জিহাদে যেতে হয়। আর আল্লাহ্ পথে জিহাদের ফযীলত কত বেশী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অথচ এই ফযীলতপূর্ণ আমলের উপর পিতা-মাতার সেবাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। যেমন হাদীছে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضى الله عنهما يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ : أَحَى وَالِدَاكَ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ:َ

فَفِيهِمَا فَجَاهِدٌ

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে জিহাদে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করল। তখন তিনি বললেন, তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত আছেন? সে বলল, হ্যাঁ। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তাহলে তাঁদের খিদমতের চেষ্টা কর'।

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হ'ল, 'তোমার পিতা-মাতা জীবিত থাকলে তাদের সেবা ও খিদমতে সর্বোচ্চ চেষ্টা কর। কারণ এটি জিহাদের স্থলাভিষিক্ত হবে' (ফাহুল বারী ১০/৪০৩)।

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أُبَايِعُكَ عَلَى الْهَجْرَةِ وَالْجِهَادِ أَبْتَغِي الأَجْرَ مِنَ اللَّهِ. قَالَ : فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَى؟ قَالَ نَعَمْ، بَلْ كِلاهُمَا. قَالَ : فَتَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ. قَالَ : نَعَمْ. قَالَ : فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا

আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমি আপনার হাতে হিজরত ও জিহাদের জন্য

বায়'আত গ্রহণ করব। এতে আমি আল্লাহর কাছে পুরস্কার ও বিনিময় আশা করি। তিনি বললেন, তোমার পিতা-মাতার মধ্যে কেউ জীবিত আছেন কি? সে বলল, হ্যাঁ, বরং উভয়ে জীবিত আছেন। তিনি বললেন, তাহ'লে তুমি আল্লাহর কাছে বিনিময় প্রত্যাশা করছ? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহ'লে তুমি তোমার পিতামাতার কাছে ফিরে যাও এবং তাদের দু'জনের সঙ্গে সদাচরণপূর্ণ জীবন যাপন কর'।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আমি তাদের উভয়কে ক্রন্দনরত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, এরপরেও তুমি আল্লাহর নিকট পুরস্কার আশা কর? লোকটি বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, 'তুমি তোমার পিতা-মাতার নিকট ফিরে যাও ও সর্বোত্তম সাহচর্য দান কর এবং তাদের কাছেই (খিদমতে) জিহাদ কর'। তিনি আরও বলেন, فَارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا ،كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا، وَأَبِي أَنْ يُبَايِعَه 'তুমি তাদের কাছে ফিরে যাও অতঃপর তাদেরকে হাসাও, যেমনভাবে তাদেরকে কাঁদিয়েছ। অতঃপর তিনি তার বায়'আত নিতে অস্বীকার করলেন'।
অন্য একটি আছারে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ الرُّوْمَ، وَإِنْ أَبَوَي يَمْنَعَانِي قَالَ : أَطِعْ أَبَوَيْكَ، وَاجْلِسْ فَإِنَّ الرُّوْمَ سَتَجِدُ

مَنْ يَغْزُوهَا غَيْرَك-

যুরারাহ বিন আওফা হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমি রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে চাই। অথচ আমার পিতা-মাতা আমাকে বাধা দেন। তিনি বললেন, পিতা-মাতার অনুগত্য কর এবং অপেক্ষা কর। কেননা খুব শীঘ্রই রোমকরা তুমি ছাড়া এমন ব্যক্তির সাক্ষাৎ লাভ করবে, যে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে'।

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, পিতা-মাতার সেবা কখনো কখনো জিহাদের চেয়ে উত্তম হয়ে থাকে। জমহুর বিদ্বানের নিকটে সন্তানের উপর জিহাদে যাওয়া হারাম হবে, যদি তাদের মুসলিম পিতা-মাতা উভয়ে কিংবা কোন একজন জিহাদে যেতে নিষেধ করেন। কেননা

তাদের সেবা করা সন্তানের জন্য 'ফরযে আইন'। পক্ষান্তরে জিহাদ করা তার জন্য 'ফরযে কিফায়াহ'। যা সে না করলেও অন্য কেউ করবে ইসলামী রাষ্ট্রের আমীরের হুকুমে।

পিতা-মাতার সেবা করা অন্যতম নেক আমল:

হাদীছে বিভিন্ন আমলকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। কতগুলো ইবাদত রয়েছে যা আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট। আবার কতগুলো ইবাদত রয়েছে যা বান্দার সাথে সংশ্লিষ্ট। বান্দার সাথে সংশ্লিষ্ট ইবাদতগুলোর মধ্যে পিতা-মাতার সাথে সুন্দর আচরণ করা সর্বশ্রেষ্ঠ আমল। যেমন হাদীছে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى الله؟ قَالَ : الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا . قَالَ : ثُمَّ أَيٌّ قَالَ : ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ. قَالَ : ثُمَّ أَيٌّ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ . قَالَ حَدَّثَنِي بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي-

আব্দুল্লাহ্ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্ রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন আমল সর্বোত্তম? তিনি বললেন, সময়মত ছালাত আদায় করা। আমি বললাম, অতঃপর কোনটি? তিনি বলেন, অতঃপর পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করা। আমি বললাম, অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহ্ পথে জিহাদ করা। অতঃপর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে আর কিছু জিজ্ঞেস না করে আমি চুপ রইলাম। আমি যদি আরো বলতাম, তবে তিনি আরও অধিক বলতেন'।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহর নিকট প্রিয় কাজের স্থানে কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, এমন আমল যা জান্নাতের নিকটবর্তী করে বা শ্রেষ্ঠ আমলের কথা বলা হয়েছে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা, এরপর পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করা, এরপর জিহাদে গমন করা'। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, পিতা-মাতার সেবা করার স্থান ছালাতের পরে এবং জিহাদে গমন করার উপরে।

পিতা-মাতার সেবায় আল্লাহর সন্তুষ্টি

সন্তানের নিকট মায়ের যেমন বিশেষ মর্যাদা রয়েছে, তেমনি পিতারও বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। পিতা যদি কোন বৈধ কারণে সন্তানের উপর অসন্তুষ্ট থাকেন, তাহ'লে আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যান। কারণ একজন সন্ত নিকে আদর্শবান হিসাবে গড়ে তুলতে পিতার আর্থিক ও মানসিক অবদান রয়েছে। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি রয়েছে'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, طَاعَةُ اللهِ طَاعَةُ الْوَالِدِ وَمَعْصِيَةُ الله مَعْصِيَةُ الوَالِه 'পিতার আনুগত্যে আল্লাহ্ আনুগত্য রয়েছে এবং পিতার অবাধ্যতায় আল্লাহর অবাধ্যতা রয়েছে'। এই হাদীছের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী কারী হানাফী বলেন, মাতাও এর মধ্যে শামিল। বরং মায়ের বিষয়টি আরো গুরুত্ববহ। যেমন অন্য বর্ণনায় এসেছে, رِضَا اللَّهِ فِي رِضَا الْوَالِدَيْنِ وَسَخَطُ ،اللَّهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْن পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পিতা-মাতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি রয়েছে'। ব্যাখ্যাকার আল্লামা মানাভী বলেন, আল্লাহ সন্তানকে পিতার আনুগত্য ও তাকে সম্মান করতে আদেশ করেছেন। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়ন করল সে কার্যতঃ আল্লাহর সাথে সুন্দর আচরণ করল এবং তাঁকে সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করল। এতে আল্লাহ্ তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার আদেশকে অমান্য করবে তিনি তার প্রতি রাগান্বিত হবেন'।

পিতা-মাতার সেবায় জান্নাত লাভ:

পিতা-মাতার আদেশ-নিষেধ পালন করলে এবং তাদের আদেশ-নিষেধকে যথাযথভাবে হেফাযত করলে জান্নাত লাভ করা যায়। কারণ তারা সন্তানের জন্য জান্নাতে যাওয়ার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। যেমন হাদীছে এসেছে-

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ فَقَالَ : إِنَّ لِي امْرَأَةً وَإِنَّ أُمِّي تَأْمُرُنِي بِطَلَاقِهَا. قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ : الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَإِنْ شِئْتَ فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوِ احْفَظْهُ

আবুদ্দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি তার নিকটে এসে বলল, আমার স্ত্রী আছে। আর আমার মা আমার স্ত্রীকে তালাক দানের নির্দেশ দিচ্ছেন। এমতাবস্থায় আমি কি করব? জবাবে আবুদ্দারদা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, 'পিতা হ'লেন জান্নাতের সর্বোত্তম দরজা। এক্ষণে তুমি তা হেফাযত করতে পার অথবা বিনষ্ট করতে পার'। অত্র হাদীছে পিতা দ্বারা জিনস তথা পিতা-মাতা উভয়কে বুঝানো হয়েছে।

পিতা-মাতার সেবায় বয়স ও রিযিক বৃদ্ধি পায়:

পিতা-মাতার খিদমত করলে আল্লাহ বেশী বেশী সৎ আমল করার সুযোগ দেন এবং আয়-রোযগারে বরকত দান করেন। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِي عُمْرِهِ وَأَنْ يُزَادَ لَهُ فِي رِزْقِهِ فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَحِمَه- ُ

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার আয়ু বৃদ্ধি করা হোক এবং তার জীবিকায় প্রশস্ততা আসুক সে যেন তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করে ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে'। সালমান ফারেসী (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا البر 'তাক্বদীর পরিবর্তন হয় না দো'আ ব্যতীত এবং বয়স বৃদ্ধি হয় না সৎকর্ম ব্যতীত'। অর্থাৎ যেসব বিষয় আল্লাহ দো'আ ব্যতীত পরিবর্তন করেন না, সেগুলি দো'আর ফলে পরিবর্তিত হয়। আর 'সৎকর্মে বয়স বৃদ্ধি পায়' অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির আয়ুতে বরকত লাভ হয়। যাতে নির্ধারিত আয়ু সীমার মধ্যে সে বেশী বেশী সৎকাজ করার তাওফীক লাভ করে এবং তা তার আখেরাতে সুফল বয়ে আনে (মিরক্বাত, মির'আত)। কেননা মানুষের রূযী ও আয়ু আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। যাতে কোন কমবেশী হয় না'। অন্য একটি হাদীছে এসেছে, যে বিপদ আপতিত হয়েছে এবং

যা এখনও আপতিত হয়নি সবক্ষেত্রেই দো'আ উপকার বয়ে নিয়ে আসে। সুতরাং হে আল্লাহ্ বান্দাগণ! তোমাদের জন্য আবশ্যক হ'ল দো'আ করা'।

পিতা-মাতার সেবা আল্লাহর পথে জিহাদে লিপ্ত থাকার সমতুল্য:

মানুষ জীবনে সফল হওয়ার জন্য নানাবিধ চেষ্টা-প্রচেষ্টা করে থাকে। কেউ দুনিয়াতে সফল হয়। আবার কেউ হয় ব্যর্থ। কিন্তু পিতা-মাতার খিদমতে সময় ব্যয় করলে দুনিয়া এবং পরকালে নিশ্চিত সফলতা রয়েছে। তাছাড়া এটি আল্লাহর পথে জিহাদের সমতুল্য বলে হাদীছে বিধৃত হয়েছে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا شَابٌ مِنَ الثَّنِيَّةِ فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ بِأَبْصَارِنَا قُلْنَا : لَوْ أَنَّ هَذَا الشَّابَ جَعَلَ شَبَابَهُ وَنَشَاطَهُ وَقُوَّتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ فَسَمِعَ مَقَالَتَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : وَمَا سَبِيلُ اللَّهِ إِلَّا مَنْ قُتِلَ؟ مَنْ سَعَى عَلَى وَالِدَيْهِ فَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَنْ سَعَى عَلَى عِيَالِهِ فَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَنْ سَعَى عَلَى نَفْسِهِ لِيُعِفَّهَا فَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَنْ سَعَى عَلَى التَّكَاثُرِ فَهُوَ فِي سَبِيْلِ الشَّيْطَانِ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে বসা ছিলাম। হঠাৎ করে একজন যুবক ছানিয়া (নিম্ন ভূমি) থেকে আগমন করল। তাকে গভীর দৃষ্টিতে অবলোকন করে আমরা বললাম, যদি এই যুবকটি তার যৌবন, উদ্যম ও শক্তি আল্লাহ্ পথে ব্যয় করত! বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদের বক্তব্য শুনে বললেন, কেবল নিহত হ'লেই কি আল্লাহর পথ? যে ব্যক্তি পিতা-মাতার খেদমতের চেষ্টা করবে সে আল্লাহ্র পথে রয়েছে। যে পরিবার-পরিজনের জন্য চেষ্টায়রত সে আল্লাহ্র পথে। যে ব্যক্তি নিজেকে গুনাহ থেকে রক্ষার চেষ্টারত সে আল্লাহর পথে। আর যে ব্যক্তি সম্পদের প্রাচুর্যতার জন্য চেষ্টারত সে শয়তানের পথে'।

পিতা-মাতার সাথে নম্র ভাষায় কথা বলায় জান্নাত লাভ:

পিতা-মাতার সাথে এমনভাবে কথা বলতে হবে যাতে তারা কোনভাবেই কষ্ট না পান। আল্লাহর নেক বান্দাদের বৈশিষ্ট্য হ'ল তারা বিনয়ের সাথে চলে এবং নম্র ও ভদ্র

ভাষায় কথা বলে। বিশেষতঃ পিতা-মাতার সাথে বিনয়ের সাথে কথা বললে জান্নাত লাভ করা যায়। যেমন হাদীছে এসেছে-

عَنْ طَيْسَلَةَ بْنِ مَيَّاسٍ قال : كُنْتُ مَعَ النَّجَدَاتِ فَأَصَبْتُ ذُنُوبًا لَا أَرَاهَا إِلَّا مِنَ الْكَبَائِرِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا هِيَ؟ قُلْتُ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: لَيْسَتْ هَذِهِ مِنَ الْكَبَائِرِ ، هُنَّ تِسْعَ : الْإِشْرَاكُ بالله، وَقَتْلُ نَسَمَةٍ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالْحَادٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَالَّذِي يَسْتَسْخِرُ وَبُكَاءُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْعُقُوقِ ثُمَّ قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ : أَتَفْرَقُ النَّارَ وَتُحِبُّ أَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ؟ قُلْتُ: إِي وَاللَّهِ، قَالَ: أَحَيٌّ وَالِدُكَ؟ قُلْتُ: عِنْدِي أُمِّي، قَالَ : فَوَالله لَوْ أَلَنْتَ لَهَا الْكَلَامَ، وَأَطْعَمْتَهَا الطَّعَامَ، لَتَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مَا اجْتَنَبْتَ الْكَبَائِرَ- َ

তায়সালা ইবনু মাইয়াস (রহঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ছিলাম। আমি কিছু পাপকাজ করে বসি যা আমার মতে কবীরা গুনাহর শামিল। আমি সেগুলি ইবনু ওমর (রাঃ)-এর কাছে উল্লেখ করলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, তা কি? আমি বললাম, এই এই ব্যাপার। তিনি বলেন, এগুলো কবীরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত নয়। কবীরা গুনাহ নয়টি। (১) আল্লাহ্ সাথে শরীক করা (২) মানুষ হত্যা (৩) জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন (৪) সতী-সাধ্বী নারীর বিরুদ্ধে যেনার মিথ্যা অপবাদ রটানো (৫) সূদ খাওয়া (৬) ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা (৭) মসজিদে ধর্মদ্রোহী কাজ করা (৮) ধর্ম নিয়ে উপহাস করা এবং (৯) সন্তানের অসদাচরণ যা পিতা-
মাতার কান্নার কারণ হয়। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আমাকে বলেন, তুমি কি জাহান্নাম থেকে দূরে থাকতে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে চাও? আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! আমি তাই চাই। তিনি বলেন, তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত আছেন? আমি বললাম, আমার মা জীবিত আছেন। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! তুমি তার সাথে নম্র ভাষায় কথা বললে এবং তার ভরণপোষণ করলে তুমি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে, যদি কবীরা গুনাহসমূহ থেকে বিরত থাক'।

পিতা-মাতার সেবায় দুনিয়ায় বিপদমুক্তি:

পিতা-মাতার সেবা করলে বিপদের সময় আল্লাহ সন্তানকে সাহায্য করেন, দো'আ করলে কবুল করেন এবং বিপদে রক্ষা করেন। যেমন বনী ইস্রাঈলের জনৈক ব্যক্তি পিতা-মাতার সেবা করার কারণে বিপদে সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছিল।

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, পূর্বকালে তিন ব্যক্তি সফরে বের হয়। পথিমধ্যে তারা মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে পতিত হয়। তখন তিনজন একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেয়। হঠাৎ গুহা মুখে একটি বড় পাথর ধ্বসে পড়ে। তাতে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। তিন জন সাধ্যমত চেষ্টা করেও তা সরাতে ব্যর্থ হয়। তখন তারা পরস্পরে বলতে থাকে যে, এই বিপদ থেকে রক্ষার কেউ নেই আল্লাহ ব্যতীত। অতএব তোমরা আল্লাহকে খুশী করার উদ্দেশ্যে জীবনে কোন সৎকর্ম করে থাকলে সেটি সঠিকভাবে বল এবং তার দোহাই দিয়ে আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা কর। সম্ভবতঃ তিনি আমাদেরকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করবেন।

তখন একজন বলল, আমার দু'জন বৃদ্ধ পিতা-মাতা ছিলেন এবং আমার ছোট ছোট কয়েকটি শিশু সন্তান ছিল। যাদেরকে আমি প্রতিপালন করতাম। আমি মেষপাল চরিয়ে যখন ফিরে আসতাম, তখন সন্তানদের পূর্বে পিতা-মাতাকে দুধ পান করাতাম। একদিন আমার ফিরতে রাত হয়ে যায়। অতঃপর আমি দুগ্ধ দোহন করি। ইতিমধ্যে পিতা-মাতা ঘুমিয়ে যান। তখন আমি তাদের মাথার নিকট দুধের পাত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি, যতক্ষণ না তারা জেগে ওঠেন। এ সময় ক্ষুধায় আমার বাচ্চারা আমার পায়ের নিকট কেঁদে গড়াগড়ি যায়। কিন্তু আমি পিতা-মাতার পূর্বে তাদেরকে পান করাতে চাইনি। এভাবে ফজর হয়ে যায়। অতঃপর তারা ঘুম থেকে উঠেন ও পান করেন। তারপরে বাচ্চাদের পান করাই। اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهَكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ، এটা তোমার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তাহ'লে তুমি আমাদের থেকে এই পাথর সরিয়ে নাও'! তখন পাথর কিছুটা সরে গেল এবং তারা আকাশ দেখতে পেল।

অতঃপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যক্তি তাদের নিজ নিজ সৎকর্মের কথা উল্লেখ করে বলল, হে আল্লাহ! যদি আমরা এগুলি তোমার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তাহ'লে তুমি আমাদের থেকে এই পাথর সরিয়ে নাও'! তখন পাথরের বাকীটুকু সরে গেল এবং আল্লাহ তাদেরকে মুক্তি দান করলেন।

পিতা-মাতার অর্থনৈতিক অধিকার

সন্তানের নিকট পিতা-মাতার যেমন সদাচরণ পাওয়ার অধিকার রয়েছে, তেমনি তাদের অর্থনৈতিক অধিকারও রয়েছে। এক সময় পিতা-মাতা বৃদ্ধ হয়ে যান। তারা কর্ম করে খেতে পারেন না। তাদের আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে যায়। এমন করুণ পরিস্থিতিতে পিতা-মাতার দায়ভার নিতে হবে সন্তানকে। যেই পিতা-মাতা অক্লান্ত পরিশ্রম করে সন্তান লালন-পালন করে বড় করে তুলেছে তাদের এ বয়সে ভালো থাকার অধিকার রয়েছে। সন্তান তার সামর্থ্য অনুপাতে পিতা-মাতার জন্য খরচ করবে। সন্তান মানুষের সবচেয়ে বড় উপার্জন। সন্তানেরা একটি বৃক্ষের ন্যায়, যাদেরকে পিতা-মাতা সেবা-যত্ন করে বড় করে তুলে। সন্তান এক সময় উপার্জন করতে শেখে। বৃক্ষের ফলদানের সময় চলে আসে। এই ফল ভোগের সর্বাধিক অধিকার রাখেন পিতা-মাতা। তাই স্ত্রী ও সন্তানের পাশাপাশি পিতা-মাতার প্রয়োজনে খরচ করতে হবে।

পিতা-মাতা সন্তানের সম্পদ থেকে কি পরিমাণ ও কখন নিতে পারবেন:

পিতা-মাতা তাদের নিজেদের প্রয়োজন অনুপাতে সন্তানের সম্পদ নিতে পারবেন। বিনা প্রয়োজনে বা পিতা-মাতা সম্পদশালী হ'লে সন্তানের সম্পদ থেকে দাবী করে বা বল প্রয়োগ করে কিছুই নিতে পারবেন না। হাদীছে এসেছে, কায়েস ইবনু আবী হাযেম হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন,

حَضَرْتُ أَبا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ : يَا خَلِيفَةَ رَسُوْلِ اللهِ إِنَّ هَذَا يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مَالِي كُلَّهُ فَيَجْتَاحُهُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْر : مَا تَقُولُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا لَكَ مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيكَ، فَقَالَ : يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ، أَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : ارْضَ بِمَا رَضِيَ اللهُ عَزَّ وَجَل

'আমি একদিন আবুবকর (রাঃ) নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় একজন লোক এসে বলল, হে রাসূলের খলীফা! ইনি আমার সমুদয় সম্পদ ছিনিয়ে নিতে চান। আবুবকর তখন তার পিতাকে বললেন, তুমি কি বল? সে বলল, হ্যাঁ। আবুবকর (রাঃ) তাকে বললেন, তোমার জন্য যতটুকু প্রয়োজন কেবল ততটুক তার সম্পদ থেকে গ্রহণ করার অধিকার রয়েছে।

সে বলল, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! রাসূল (ছাঃ) কি বলেননি যে, 'তুমি ও তোমার সমুদয় সম্পদ তোমার পিতার'? আবুবকর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ যতটুকুতে খুশি হয়েছেন তুমি ততটুকুতে খুশি হও'। অত্র হাদীছের সনদে মুনযির বিন যিয়াদ নামক দুর্বল বর্ণনাকারী থাকায় সনদ যঈফ হ'লেও হাদীছের মর্ম সঠিক। কারণ পিতা-মাতা-সন্তানের সমুদয় সম্পদ নিতে পারবে না। তাছাড়া এর স্বপক্ষে মারফু ছহীহ হাদীছ রয়েছে। যেমন-আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,
، إِنَّ أَوْلَادَكُمْ هِبَةُ اللَّهِ لَكُمْ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ، فَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ إِذَا

- اخْتَجْتُمْ إِلَيْهَا 'নিশ্চয় তোমাদের সন্তানেরা তোমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে দান। তিনি যাকে খুশি তাকে কন্যা সন্তান দান করেন, যাকে খুশি তাকে ছেলে সন্তান দান করেন। তারা ও তাদের সম্পদ তোমাদেরই যখন তোমরা সেগুলোর প্রয়োজন বোধ করবে'। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, كل أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِين অধিক হকদার তার সন্তান, পিতা ও সকল মানুষ হ'তে'। তিনি আরো ، لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسِه، ছাড়া তার সম্পদ গ্রহণ করা হালাল নয়'।

শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, সন্তানের উপর আবশ্যক হ'ল তার পিতার জন্য খরচ করা, তার পিতার স্ত্রীর জন্য খরচ করা ও ছোট ভাইদের জন্য খরচ করা। সে যদি এমনটি না করে তাহ'লে সে পিতার অবাধ্য, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী এবং দুনিয়া ও পরকালে আল্লাহর শাস্তির জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হবে'।

ওলামায়ে কেরাম পিতা-মাতা কর্তৃক সন্তানের সম্পদ গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু শর্তারোপ করেছেন। যেমন- ১. পিতা-মাতাকে দরিদ্র হ'তে হবে, যাদের কোন সম্পদ নেই এবং কোন উপার্জনও নেই। ২. পিতা-মাতার প্রতি খরচ করার জন্য সন্তানের সামর্থ্য থাকতে হবে। ইবনু কুদামা (রহঃ) দু'টি শর্ত উল্লেখ্য করেন أَحَدُهُمَا أَلا يُجْحِفَ بالأبن، ولا يضر به، ولا يأخذ شَيْئًا تَعلَّقت به حَاجَتُه الثَّانِي: أَلا يَأْخُذَ مِن مَالِ وَلَدِهِ فَيُعْطِيَهُ الْآخَرِ، 'প্রথমত, সম্পদ নেওয়ার কারণে সন্তানের প্রতি যাতে যুলুম না হয়, এর কারণে সে যেন ক্ষতিগ্রস্থ না হয় এবং পিতা এমন কিছু নিবেন না যা সন্তানের প্রয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট। দ্বিতীয়ত, পিতা এক সন্তানের সম্পদ নিয়ে আরেক সন্তানকে দিবেন না'।"

কোন কোন বিদ্বান পিতা কর্তৃক সন্তানের সম্পদ গ্রহণের জন্য ছয়টি শর্ত আরোপ করেছেন। ১. পিতা এমন সম্পদ গ্রহণ করবেন যাতে সন্তান ক্ষতিগ্রস্থ না হয় বা যে সম্পদের সন্তানের প্রয়োজন নেই। ২. অন্য সন্তানকে না দেওয়া। ৩. তাদের যে কেউ মৃত্যু রোগে আক্রান্ত না হওয়া। ৪. সন্তান মুসলিম ও পিতা কাফির না হওয়া। ৫. সম্পদ মওজুদ থাকা। ৬. মালিকানার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা'।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, وَلِأَبِيهِ أَنْ يَأْخُذَ مِن as for مَالِهِ مَا يَحْتَاجُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الِابْنِ، وَلَيْسَ لِلابْنِ مَنْعُه সম্পদে প্রয়োজনবোধ করলে তার অনুমতি ব্যতীত গ্রহণ করবে। এতে সন্তানের বাধা দেওয়ার অধিকার নেই'।

সন্তানের পরিত্যক্ত সম্পদে পিতা-মাতার অধিকার:

পিতা-মাতার পূর্বে সন্তান মারা গেলে সন্তানের পরিত্যক্ত সম্পদে পিতা-মাতা ভাগ পাবেন। পিতা তিন অবস্থায় সন্তানের সম্পত্তিতে অংশীদার হবেন। ১. সন্তানের ছেলে বা ছেলের ছেলে থাকলে পিতা সম্পদের এক-ষষ্ঠাংশ পাবেন। ২. সন্তানের স্ত্রী-সন্তান না থাকলে পিতা ওয়ারিছ ও আছাবা হিসাবে সন্তানের সমুদয় সম্পদ পাবেন। ৩. সন্তানের কেবল কন্যা সন্তান থাকলে পিতা ওয়ারিছ হিসাবে এক-ষষ্ঠাংশ ও আছাবা হিসাবে বাকী সম্পত্তি পাবেন। অপর দিকে মাতাও তিনটি ক্ষেত্রে সন্তানের সম্পত্তিতে অংশীদার হবেন। ১. সন্তানের সন্তান থাকলে মাতা সম্পদের এক-ষষ্ঠাংশ পাবেন, ২. সন্তানের কোন সন্তান ও ভাই-বোন না থাকলে মাতা সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ পাবেন ৩. সন্তানের একাধিক ভাই-বোন থাকলে মাতা সম্পদের এক-ষষ্ঠাংশ পাবেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا-

'মৃতের পিতা-মাতার প্রত্যেকে পরিত্যক্ত সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ করে পাবে, যদি মৃতের কোন পুত্র সন্তান থাকে। আর যদি না থাকে এবং কেবল পিতা-মাতাই ওয়ারিছ হয়, তাহ'লে মা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ। কিন্তু যদি মৃতের ভাইয়েরা

থাকে, তাহ'লে মা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ মৃতের অছিয়ত পূরণ করার পর এবং তার ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও পুত্রদের মধ্যে কে তোমাদের জন্য অধিক উপকারী, তা তোমরা জানো না। এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়' (নিসা ৪/১১)।

পিতা-মাতার মৃত্যুর পরে সন্তানের করণীয়

পিতা-মাতা মৃত্যুর পরেও সন্তানের নিকট পরোক্ষভাবে সুন্দর আচরণ পাওয়ার অধিকার রাখেন। যেমন পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধবের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, তাদের জন্য দো'আ করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাদের অছিয়ত পূরণ করা, তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করা, মানত পূর্ণ করা, ঋণ পরিশোধ করা, কাযা ছাওম পালন করা, বদলী হজ্জ আদায় করা ও দান-ছাদাক্বাহ করা ইত্যাদি। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبَوَى شَيْءٌ أَبَرُّهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا قَالَ : نَعَمِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا وَالاسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهما-

আবু উসাইদ (রাঃ) বলেন, আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এ সময় বনু সালিমা গোত্রের এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহ্ রাসূল! আমার পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার কোন অবকাশ আছে কি? তিনি বলেন, হ্যাঁ, চারটি উপায় আছে। (১) তাদের জন্য দো'আ করা (২) তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা (৩) তাদের প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ করা এবং (৪) তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করা, যারা তাদের মাধ্যমে তোমার আত্মীয় ও (৫) তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান করা'।

পিতা-মাতার মৃত্যুর পর করণীয় হ'ল- তাদের জানাযার ছালাত আদায় করা, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাদের মৃত্যুর পর তাদের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করা, তাদের মাধ্যমে সৃষ্ট আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা এবং তাদের প্রিয় মানুষদের শ্রদ্ধা করা।

পূর্বোক্ত হাদীছে ছালাত দ্বারা উদ্দেশ্য জানাযার ছালাত অথবা দো'আ করা। হানাফী বিদ্বান মোল্লা আলী কারী (রহঃ) বলেন, ছালাত দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল তাদের জন্য আল্লাহর রহমতের দো'আ করা। ইসতিগফার দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। তাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করা অর্থ হ'ল তাদের অছিয়ত বাস্তবায়ন করা। তাদের কারণে সৃষ্ট আত্মীয়ের বন্ধন অটুট রাখার অর্থ হ'ল নিকটাত্মীয়ের প্রতি ইহসান করা। বায়হাক্বীর এক বর্ণনার শব্দগুলো নিম্নরূপ:

وَصِلَةُ رَحِمِهِمَا الَّتِي لَا رَحِمَ لَكَ إِلَّا مِنْ قِبَلِهِمَا فَقَالَ مَا أَكْثَرَ هَذَا وَأَطْيَبَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَاعْمَلْ بِهِ فَإِنَّهُ يَصِلُ إِلَيْهِمَا-

অর্থাৎ আর তাদের সাথে বন্ধন অটুট রাখ যাদের সাথে তোমার পিতা-মাতার বন্ধন রয়েছে। নবী (ছাঃ)-এর কথা শুনে লোকটি বলল, হে আল্লাহ্ রাসূল! এটি কতই তাৎপর্যপূর্ণ ও পবিত্র বাণী!। রাসূল (ছাঃ) বললেন, অতএব তুমি এর প্রতি আমল কর তাহ'লে এর মাধ্যমে মৃত্যুর পরও তোমার পিতা-মাতার নিকট এর ছওয়াব পৌঁছবে।

মৃত্যুর পর পিতা-মাতার প্রতি করণীয় বিষয়গুলো নিম্নে আলোচন করা হ'ল-

(ক) পিতা-মাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা:

পিতা-মাতার জন্য সকলকে প্রার্থনা করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতার জন্য দো'আ শিক্ষা দিয়েছেন এবং দো'আ করার আদেশও দিয়েছেন। তিনি বলেন, رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرا 'হে পালনকর্তা!তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন' (বনী ইসরাঈল ১৭/২৪)। মৃত্যুর পর মানুষের তিনটি আমল জারী থাকে, তার মধ্যে সৎ সন্তানের দো'আ সব থেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَه-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন কোন মানুষ মারা যায়, তখন তার তিনটি আমল ব্যতীত সকল কর্ম বন্ধ হয়ে যায় (১) ছাদাক্বা জারিয়াহ (২) উপকারী ইলম এবং (৩) সৎ সন্তান যে তার জন্য দো'আ করে'।

এর ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কেরাম বলেন, (১) ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ। যেমন মসজিদ, মাদরাসা, ইয়াতীমখানা, রাস্তা ও বাঁধ নির্মাণ, অনাবাদী জমিকে আবাদকরণ, সুপেয় পানির ব্যবস্থাকরণ, দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল স্থাপন, বই ক্রয় করে বা ছাপিয়ে বিতরণ, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি। (২) ইলম,যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়। যা মানুষকে নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহর পথ দেখায় এবং যাবতীয় শিরক ও বিদ'আত হ'তে বিরত রাখে। উক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে শিক্ষাদান করা, ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে সহযোগিতা প্রদান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমল সম্পন্ন বই-প্রবন্ধ লেখা, ছাপানো ও বিতরণ করা এবং এজন্য অন্যান্য স্থায়ী প্রচার মাধ্যম স্থাপন ও পরিচালনা করা ইত্যাদি। (৩) সুসন্তান, যে তার জন্য দো'আ করে'। মৃতের জন্য সর্বোত্তম হাদিয়া হ'ল সুসন্তান, যে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, ছাদাক্বা করে, তার পক্ষ হ'তে হজ্জ করে ইত্যাদি।

অন্য বর্ণনায় রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

سَبْعٌ يَجْرِي لِلْعَبْدِ أَجْرُهُنَّ بَعْدَ مَوْتِهِ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ: مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا ، أَوْ أَجْرَى نَهَرًا، أَوْ حفَرَ بِئْرًا، أَوْ غَرَسَ نَخْلًا، أَوْ بَنَى مَسْجِدًا، أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ، أَوْ، وَرَّثَ مُصْحَفًا

'মৃত্যুর পর কবরে থাকা অবস্থায় বান্দার সাতটি আমল জারী থাকে। (১) দ্বীনী ইলম শিক্ষা দান করা (২) নদী-নালা প্রবাহিত করা (৩) কূপ খনন করা (৪) খেজুর তথা ফলবান বৃক্ষ রোপণ করা (৫) মসজিদ নির্মাণ করা (৬) এমন সন্তান রেখে যাওয়া, যে পিতার মৃত্যুর পর তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে (৭) কুরআন বিতরণ করা/কুরআনের ওয়ারিছ রেখে যাওয়া'।

সন্তানের প্রার্থনার কারণে পিতা-মাতার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়:

পিতা-মাতার জন্য সন্তান একটি বড় নে'মত। তাই সন্তানকে আদর্শবান করে গড়ে তুলতে পারলে পৃথিবীতে সে যেমন পিতা-মাতার জন্য চক্ষু শীতলকারী হবে, তেমনি পরকালে নাজাতের কারণ হবে। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ : يَارَبِّ أَنَّي لِي هَذِهِ فَيَقُولُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তাঁর কোন নেক বান্দার মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন।

এ অবস্থা দেখে সে (নেক বান্দা) বলবে, হে আমার রব! আমার এ মর্যাদা কিভাবে বৃদ্ধি হ'ল? তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমার সন্তান-সন্ততি তোমার জন্য মাগফিরাত কামনা করার কারণে' । وَلَدِكَ لَك শব্দটি ছেলে-মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। এখানে এ দ্বারা মুমিন সন্তান উদ্দেশ্য। আর এটি বিবাহের উপকারসমূহের একটি উপকার ও সর্বাপেক্ষা বড় উপকার এবং ঐ বস্তুসমূহের একটি যা পুণ্য এবং কর্ম থেকে মরণের পর মুমিন ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়। যেমন হাদীছে এসেছে। আল্লামা ত্বীবী বলেন, পূর্বোক্ত হাদীছটি এ প্রমাণ বহন করছে যে, ক্ষমা প্রার্থনা দ্বারা বড় বড় গুনাহ মোচন করা হয়'।

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: تُرْفَعُ لِلْمَيتِ بَعْدَ مَوْتِهِ دَرَجَتُهُ، فَيَقُولُ : أَيْ رَبِّ، أَيُّ شَيْءٍ هَذَا؟ فَيُقَالُ : وَلَدُكَ اسْتَغْفَرَ لَكَ

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, মানুষের মৃত্যুর পর তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে। তখন সে বলবে, হে প্রভু! এই মর্যাদা কীভাবে হ'ল? তাকে বলা হবে, তোমার সন্তান তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছে'।

(খ) ঋণ পরিশোধ করা:

পিতা-মাতার ঋণ থাকলে সন্তানরা সর্বপ্রথম তাদের ঋণ পরিশোধ করবে।কারণ ঋণ এমন এক বোঝা যা ঋণদাতা ব্যতীত কেউ হালকা করতে পারবে না। সেজন্য পিতা-মাতার যাবতীয় সম্পদ দ্বারা হ'লেও তাদের ঋণ পরিশোধ করবে, সামর্থ্য না থাকলে ঋণদাতার নিকট থেকে মাফ করিয়ে নিবে। মাফ না করলে দাতাদের সহযোগিতা নিয়ে হ'লেও তা পরিশোধ করার চেষ্টা করবে। কারণ ঋণ মাফ হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা মাইয়েতের সম্পদ বণ্টনের পূর্বে ঋণ পরিশোধের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا এবং তার ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও পুত্রদের মধ্যে কে তোমাদের জন্য অধিক উপকারী, তা তোমরা জানো না। এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়' (নিসা ৪/১১)। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْه- ُ

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মুমিন ব্যক্তির রূহ তার ঋণের কারণে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে, যতক্ষণ না তা পরিশোধ করা হয়'।

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ঋণ ছাড়া শহীদের সকল গুনাহ্ই মাফ করে দেওয়া হবে'।'

অন্য আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءِ، فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِه 'আমি মুমিনদের নিকট তাদের প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়। যে ব্যক্তি ঋণের বোঝা নিয়ে মারা যায় আর ঋণ পরিশোধ করার মত সম্পদ রেখে না যায়, তাহলে তা পরিশোধ

করার দায়িত্ব আমার। আর যে ব্যক্তি সম্পদ রেখে যায়, তা তার উত্তরাধিকারীদের জন্য'।

ঋণ দু'প্রকার: ১. যে ব্যক্তি তার ওপর থাকা ঋণ পরিশোধের ইচ্ছা নিয়ে মৃত্যুবরণ করল, আমি তার অভিভাবক।

২. যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধের ইচ্ছা না করে (আত্মসাৎ করার ইচ্ছায়) মৃত্যুবরণ করল। এর কারণে সেদিন তার নেকী হ'তে কর্তন করা হবে, যেদিনে কোন দিরহাম ও দীনার থাকবে না।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে যদি কেউ খণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যেত এবং খণ পরিশোধের দায়িত্ব কেউ না নিত, সেক্ষেত্রে রাসূল (সাঃ) তাঁর জানাযার ছালাত আদায় করতেন না। কিন্তু যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে বিজয় দান করলেন এবং ইসলামী রাষ্ট্র অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হ'ল তখন তিনি রাষ্ট্রের প্রজাদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেন, 'আমি মুমিনদের নিকট তাদের প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়'। ফলে ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব তিনি নিজেই নিয়ে নেন। সুতরাং বর্তমান শাসক গোষ্ঠীর ভাবা উচিত তাদের উপর রাষ্ট্রের প্রজাদের কী দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। আর এটা যাকাত বণ্টনের আটটি খাতের একটি।

গ) অছিয়ত পূর্ণ করা:

পিতা-মাতার কোন ন্যায়সঙ্গত অছিয়ত থাকলে তা পালন করা সন্তানদের জন্য আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'কিন্তু যদি মৃতের ভাইয়েরা থাকে, তাহ'লে মা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ মৃতের অছিয়ত পূরণ করার পর এবং তার ঋণ পরিশোধের পর (নিসা ৪/১১)।... কাউকে কোনরূপ ক্ষতি না করে। এটি আল্লাহ প্রদত্ত বিধান। আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও সহনশীল' (নিসা ৪/১২)। তিনি আরো বলেন, كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, তখন যদি সে কিছু ধন-সম্পদ ছেড়ে যায়, তবে তার জন্য অছিয়ত করা বিধিবদ্ধ করা হ'ল পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য ন্যায়ানুগভাবে। এটি আল্লাহভীরুদের জন্য আবশ্যিক বিষয়' (বাক্বারাহ ২/১৮০)। একজন ব্যক্তি তার সম্পদের সর্বোচ্চ এক তৃতীয়াংশ সম্পদ অছিয়ত করতে পারে। এর বেশী করলে তা পালন যাবে না'।

আমের বিন সা'দ বর্ণনা করেন, তার পিতা সা'দ বর্ণনা করেন, বিদায় হজ্জের সময় আমি রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুপথযাত্রী হয়ে পড়ছিলাম। নবী করীম (ছাঃ) সে সময় আমাকে দেখতে এলেন। তখন আমি বললাম, আমি যে রোগাক্রান্ত, তাতো আপনি দেখছেন। আমি একজন ধন্যাঢ্য লোক। আমার এক মেয়ে ব্যতীত কোন ওয়ারিছ নেই। তাই আমি কি আমার দুইতৃতীয়াংশ মাল ছাদাক্বাহ করে দিতে পারি? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তবে অর্ধেক মাল? তিনি বললেন, না। এক-তৃতীয়াংশ অনেক। তোমার ওয়ারিছদের মানুষের কাছে ভিক্ষার হাত বাড়ানোর মত অভাবী রেখে যাওয়ার চেয়ে তাদের সম্পদশালী রেখে যাওয়া তোমার জন্য অনেক উত্তম। আর তুমি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যা কিছুই ব্যয় করবে নিশ্চয়ই তার প্রতিদান দেয়া হবে। এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যে লোকমাটি তুলে দিয়ে থাকো, তোমাকে এর প্রতিদান দেয়া হবে। আমি বললাম, তা হ'লে আমার সঙ্গীগণের পরেও কি আমি বেঁচে থাকব? তিনি বললেন, নিশ্চয়ই তুমি এদের পরে বেঁচে থাকলে তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যা কিছু নেক আমল করো না কেন, এর বদলে তোমার মর্যাদা ও সম্মান আরও বেড়ে যাবে। আশা করা যায় যে, তুমি আরও কিছু দিন বেঁচে থাকবে। এমনকি তোমার দ্বারা অনেক কওম উপকৃত হবে। আর অনেক সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তারপর তিনি দো'আ করলেন, হে আল্লাহ! আপনি আমার ছাহাবীগণের হিজরতকে বহাল রাখুন। আর তাদের পেছনে ফিরে যেতে দেবেন না। কিন্তু সা'দ ইবনু খাওলার দুর্ভাগ্য। (কারণ তিনি বিদায় হজ্জের সময় মক্কায় মারা যান) সা'দ বলেন, মক্কায় তাঁর মৃত্যু হওয়ায় রাসূল (ছাঃ) তাঁর জন্য শোক প্রকাশ করেছেন'।

(ঘ) মানত পূর্ণ করা:

পিতা-মাতার কোন শরী'আতসম্মত মানত থাকলে তা পালন করা সন্তানের জন্য আবশ্যক।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما : قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أُمِّى مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ أَفَأَصُوْمُ عَنْهَا قَالَ : أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ أَكَانَ يُؤَدِّى ذَلِكَ عَنْهَا. نَعَمْ قَالَ : فَصُومِي عَنْ أُمِّك-

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা রাসূল (স.), এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা মৃত্যুবরণ করেছেন। তার উপর মান্নতের ছাওমের কাযা রয়েছে। আমি তার পক্ষ হ'তে এ ছাওম আদায় করতে পারি কি? তখন তিনি বললেন, যদি তোমার মায়ের উপর কোন ঋণ থাকত তাহ'লে তুমি তা পরিশোধ করে দিতে, তবে তা তার পক্ষ হ'তে আদায় হ'ত কি? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, 'তোমার মায়ের পক্ষ হ'তে তুমি ছাওম পালন কর'।

(ঙ) কাফ্ফারা আদায় করা:

পিতা-মাতার উপর কোন কাফফারা থাকলে সন্তান তা আদায় করবে। তা কসমের কাফ্ফারা হ'তে পারে বা ভুলবশতঃ হত্যার কাফ্ফারাও হ'তে পারে। কারণ এগুলো পিতা-মাতার ঋণের অর্ন্তভুক্ত। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ فَنَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ أَنْ تَصُوْمَ شَهْرًا فَنَجَّاهَا اللهُ فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى مَاتَتْ فَجَاءَتِ ابْنَتُهَا أَوْ أُخْتُهَا إِلَى رَسُوْلِ الله صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا-

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক মহিলা সমুদ্রে ভ্রমণে গিয়ে মানত করল, আল্লাহ তাকে নিরাপদে ফেরার সুযোগ দিলে সে একমাস ছিয়াম পালন করবে। অতঃপর আল্লাহ তাকে বিপদ থেকে মুক্তি দিলেন। কিন্তু ছিয়াম পালনের পূর্বেই সে মারা গেল। তার মেয়ে অথবা বোন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসলে তিনি তাকে মৃতের পক্ষ থেকে ছিয়াম পালনের নির্দেশ দিলেন'।

চ) ফরয ছিয়াম, মানতের ছিয়াম এবং বদলী হজ্জ ও ওমরা পালন করা:

ফরয ছিয়াম যা সফর কিংবা রোগের কারণে আদায় করতে পারেনি। পরবর্তীতে আদায় করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু হঠাৎ মৃত্যুবরণ করায় কাযা আদায় করতে পারেনি। এমন ছিয়াম নিকটতম আত্মীয়রা আদায় করে দিবে। আর যদি কোন ব্যক্তি মারাত্মক রোগের কারণে রামাযানের ছিয়াম পালনে অক্ষম হয় এবং রামাযানের পরেও মৃত্যু অবধি সুস্থ হতে না পারে তাহ'লে তার ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করতে হবে না। কারণ এমন সময় তার জন্য ছিয়াম ফরয নয়। আর যদি কেউ চির রোগী হয় যার সুস্থ হওয়ার সম্ভবনা নেই। সে নিজে বা তার আত্মীয়রা প্রতিদিন একজন করে মিসকীনকে খাবার খাওয়াবে। অনুরূপভাবে সম্পদশালী পিতা-মাতা যদি হজ্জ সম্পাদন না করে মারা যায় এবং পর্যাপ্ত সম্পদ রেখে যায় তাহ'লে সন্তানের জন্য পিতা-মাতার পক্ষ থেকে বদলী হজ্জ ও ওমরা পালন সমীচীন।যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّه- ُ

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ছিয়ামের ক্বাযা যিম্মায় রেখে যদি কোন ব্যক্তি মারা যায় তাহ'লে তার নিকটাত্মীয় তার পক্ষ হ'তে ছিয়াম আদায় করবে'।

বুরায়দা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে আমি বসা ছিলাম। এমন সময় তার নিকট এক মহিলা এসে বলল, হে আল্লাহ্ রাসূল! আমি আমার মাকে একটি দাসী দান করেছিলাম। তিনি মারা গেছেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি ছাওয়াবের অধিকারী হয়ে গেছ এবং উত্তরাধিকার স্বত্ত্ব দাসীটি তোমাকে ফেরত দিয়েছে। সে বলল, হে আল্লাহ্ রাসূল! এক মাসের ছিয়াম আদায় করা তার বাকী আছে, তার পক্ষ হ'তে আমি কি ছিয়াম আদায় করতে পারি? তিনি বললেন, তার পক্ষে তুমি ছিয়াম আদায় কর। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! কখনও তিনি হজ্জ করেননি। তার পক্ষ হ'তে কি আমি হজ্জ আদায় করতে পারি? তিনি বলেন, হ্যাঁ, তার পক্ষ হতে তুমি হজ্জ আদায় কর'।

ছ) পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে ভাল আচরণ করা:

পিতা-মাতার সাথে তাদের জীবদ্দশায় ভাল সম্পর্ক ছিল এমন ব্যক্তিদের সাথে সুসম্পর্ক রাখতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْمَرْءِ

أَهْلَ وُدِّ أَبِيْهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّي 'সবচেয়ে বড় নেকীর কাজ এই যে, ব্যক্তি তার পিতার ইন্তিকালের পর তার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে'।

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর অন্য কোন সহধর্মিণীর প্রতি এতটুকু অভিমান করিনি, যতটুকু খাদীজা (রাঃ)-এর
প্রতি করেছি। অথচ আমি তাকে দেখিনি। কিন্তু নবী করীম (ছাঃ) তার কথা অধিক সময় আলোচনা করতেন। কোন কোন সময় বকরী যবেহ করে গোশতের পরিমাণ বিবেচনায় হাড়-গোশতকে ছোট ছোট টুকরা করে হ'লেও খাদীজা (রাঃ)-এর বান্ধবীদের ঘরে পৌঁছে দিতেন। আমি কোন সময় অভিমানের সুরে নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতাম, (আপনার অবস্থা দৃষ্টে) মনে হয়, খাদীজা (রাঃ) ছাড়া পৃথিবীতে যেন আর কোন নারী নেই। প্রত্যুত্তরে তিনি বলতেন, হ্যাঁ। তিনি এমন ছিলেন, তার গর্ভে আমার সন্তান জন্মেছিল'। অন্য বর্ণনায় রয়েছে وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ فَيُهْدِى فِي خَلاَئِلِهَا مِنْهَا مَا يَسَعُهُنَّ، (রাঃ)-এর বান্ধবীদের নিকট এমন পরিমাণ গোশত নবী করীম (ছাঃ) হাদিয়া স্বরূপ পাঠিয়ে দিতেন, যা তাদের জন্য যথেষ্ট হত'। আরেক বর্ননায় আেছ إِذَا ذَبَحَ الشَّاةَ فَيَقُوْلُ أَرْسِلُوا بِهَا إِلَى أَصْدِقَاءِ خَدِيجَةَ ، 'রাসূল (ছাঃ) যখন বকরী যবেহ করতেন তখন বলতেন, এ গোশত খাদীজার বান্ধবীদের পাঠিয়ে দাও'।

জ) দান-ছাদাক্বাহ করা:

পিতা-মাতার জন্য সন্তান দো'আ করা ছাড়াও দান-ছাদাক্বাহ করবে। এতে দানকারীও ছওয়াব পাবে। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَإِنِّي أَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَلِيَ أَجْرٌ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا قَالَ : نَعَمْ

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-কে বললেন, আমার মায়ের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে, কিন্তু আমার বিশ্বাস তিনি (মৃত্যুর পূর্বে) কথা বলতে সক্ষম হ'লে কিছু ছাদাক্বাহ করে যেতেন। এখন আমি তাঁর পক্ষ হ'তে ছাদাক্বাহ করলে আমার জন্য কোন ছওয়াব রয়েছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ'।

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, অত্র হাদীছের বাহ্যিক অর্থ থেকে বুঝা যায়, তিনি কথা বলতে সক্ষম হননি তাই ছাদাক্বাও দেননি। সাঈদ বিন সা'দ বিন উবাদাহ হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, সা'দ বিন উবাদাহ নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে কোন এক যুদ্ধে গমন করলেন। ইত্যবসরে সা'দের মায়ের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসল। তখন তাকে বলা হ'ল, আপনি অছিয়ত করেন। তিনি বললেন, কিসের অছিয়ত করব? ধন-সম্পদ যা আছে তাতো সা'দের। সা'দ ফিরে আসার পূবেই তিনি মারা গেলেন। সা'দ ফিরে আসলে বিষয়টি তাকে বলা হ'ল। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তার পক্ষ থেকে ছাদাক্বাহ করলে এতে তার উপকার হবে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সা'দ (রাঃ) বললেন, অমুক অমুক বাগান তার জন্য ছাদাক্বাহ। তিনি বাগানটির নাম উল্লেখ করেছিলেন'।

মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে ছাদাক্বাহ জায়েয এবং এতে মৃত ব্যক্তি ছওয়াবের অধিকারী হবে। বিশেষ করে ছাদাক্বাহ যখন মৃত ব্যক্তির সন্তান করবেন তখন আরো বেশী ছওয়াব হবে। অনুরূপভাবে দো'আও পৌঁছবে। সুতরাং সন্তানের পক্ষ থেকে এই কাজগুলো পিতা-মাতার জন্য আঞ্জাম দেওয়া হ'লে পিতা-মাতা ছওয়াব তো পাবেন। পাশাপাশি দানকারী সন্তানও ছওয়াব পাবেন।

হাদীছটি থেকে আরো বুঝা যায় যে, যিনি বা যারা হঠাৎ মারা গেলেন তাদের পক্ষ থেকে ছাদাক্বা করা মুস্তাহাব। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَت
يَا رَسُولَ اللهُ إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَوْلَا ذَلِك

لَتَصَدَّقَتْ وَأَعْطَتْ أَفَيُجْزِئُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى عليه وسلم نَعَمْ فَتَصَدَّقِي عَنْهَا
-

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক স্ত্রীলোক বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার মা হঠাৎ মারা গেছেন। তিনি এভাবে মারা না গেলে ছাদাক্বাহ ও দান করে যেতেন। এখন আমি যদি তার পক্ষ থেকে ছাদাক্বাহ করি তবে তিনি কি এর ছওয়াব পাবেন? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ, তুমি তার পক্ষ থেকে ছাদাক্বাহ কর'।

পিতা-মাতাকে গালি দেওয়া:

পিতা-মাতাকে গালি দেওয়া কবীরা গুনাহ এবং এটি তাদের অবাধ্যতার চরম বহিঃপ্রকাশ। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْه কবীরাগুনাহের মধ্যে একটি হ'ল নিজ পিতা-মাতাকে গালি দেয়া'। ছাহাবীগণ বলেন, কেউ কি নিজ পিতা-মাতাকে গালি দিতে পারে? তিনি বলেন, সে অন্যের পিতা-মাতাকে গালি দিবে, ফলে ঐ ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে গালি দিবে'। عَنْ عبد الله عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ: مِنَ الْكَبَائِرِ عِنْدَ الله تَعَالَى أَنْ يَسْتَسِبُّ الرَّجُلُ لِوَالِدِه -(রহঃ) বলেন, পিতা-মাতাকে গালি শুনানো আল্লাহর নিকট একটি কবীরা গুনাহ'। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন,

إِذَا شَتَمَ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَاعْتَدَى عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُعَاقَبَ عُقُوبَةً بَلِيْغَةً

'যখন কোন ব্যক্তি তার পিতাকে গালি দেবে এবং এক্ষেত্রে সীমালংঘন করবে, তাকে কঠিন শাস্তি প্রদান করা আবশ্যক হয়ে যাবে'।

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ : هَلْ خَصَّكُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ لَمْ يَخْصُ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً؟ قَالَ : مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ لَمْ يَخُصَّ بِهِ النَّاسِ، إِلَّا مَا فِي قِرَابِ سَيْفِي، ثُمَّ أَخْرَجَ صَحِيفَةً، فَإِذَا فِيهَا مَكْتُوبٌ : لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا-

আবু তোফায়েল (রাঃ) বলেন, আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, নবী করীম (ছাঃ) কি কোন বিশেষ ব্যাপারে আপনাকে বলেছেন, যা সর্বসাধারণকে বলেননি? তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) অন্য কাউকে বলেননি এমন কোন বিশেষ কথা একান্তভাবে আমাকে বলেননি। অবশ্য আমার তরবারির খাপের মধ্যে যা আছে ততটুকুই। অতঃপর তিনি একখানি ছফীহা বের করলেন। তাতে লেখা ছিল- 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে পশু যবাই করে তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ। যে ব্যক্তি জমির সীমানা চিহ্ন চুরি করে তার প্রতি আল্লাহ্ অভিশাপ। যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে অভিসম্পাত করে তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ। যে ব্যক্তি বিদ'আতীকে আশ্রয় দেয় তার প্রতি আল্লাহ্ অভিশাপ'।

পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া:

পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া এমন গুনাহ যা খালেছ অন্তরে তওবা ছাড়া ক্ষমা হয় না। সেজন্য সর্বাস্থায় পিতা-মাতার অনুগত থাকতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,
قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

'তুমি বল, আমি তোমাদেরকে ঐ বিষয়গুলো পাঠ করে শুনাই যা তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের উপর হারাম করেছেন। আর তা হ'ল এই যে, তোমরা তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে' (আন'আম ৬/১৫১)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُوْنَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

'আর যখন আমরা বনু ইস্রাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কারো ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও অভাবগ্রস্তদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে' (বাক্বারাহ ২/৮৩)।

عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الأُمَّهَاتِ، وَمَنْعَ وَهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ - وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ (রাঃ) হ'তে

বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) ইরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর হারাম করেছেন মায়েদের অবাধ্যতা, কারো প্রাপ্য না দেয়া ও অন্যায়ভাবে কিছু নেয়া এবং কন্যা সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করা। আর অপছন্দ করেছেন অনর্থক বাক্য ব্যয়, অতিরিক্ত প্রশ্ন করা এবং মাল বিনষ্ট করা'।

অন্য হাদীছে এসেছে,

আবু বাকরা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহ সম্পর্কে খবর দিব না

(৩ বার)? তারা বলল, বলুন হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, আল্লাহ্ সাথে শিরক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। এ সময় তিনি ঠেস দিয়ে ছিলেন। অতঃপর উঠে বসে বললেন, সাবধান! মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। কথাটি তিনি বলতেই থাকলেন। এমনকি আমরা বললাম, যদি তিনি চুপ করতেন' ।অত্র হাদীছে বুঝা যায় যে, শিরকের পরেই মহাপাপ হ'ল পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। এরপরে মহাপাপ হ'ল মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।

উবায়েদ ইবন উমায়ের (রহঃ) তাঁর পিতা হ'তে বর্ণনা করেছেন, তার সাথে বর্ণনাকারীর সখ্যতা ছিল। তিনি বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করে হে আল্লাহর রাসূল! কবীরা গুনাহ কোনগুলো? তিনি বলেন, তা নয়টি। তখন তিনি উপরোক্ত হাদীছে বর্ণিত গুনাহগুলোর উল্লেখ করেন এবং অতিরিক্ত এও বলেন, মুসলমান পিতা ও মাতার অবাধ্য হওয়া এবং আল্লাহ্ ঘরকে (কা'বা) সম্মান না করা, যা তোমাদের জীবনে ও মরণে কিবলা' ।

পিতা-মাতাকে অস্বীকার করা:

পৃথিবীতে মানুষের আসার একমাত্র মাধ্যম পিতা-মাতা। অনেকে ভাল চাকুরী করার সুবাদে বা অন্য কোন কারণে বাবা-মায়ের পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করে। কেউবা বাবা-মাকে অস্বীকার করে বসে। এগুলো ইসলামী শরী'আতে হারাম ও কবীরা গুনাহ। বরং কেউ বাবা-মাকে অস্বীকার করলে তার স্থান হবে জাহান্নামে। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ فِرْيَةً لَرَجُلٌ هَاجَى رَجُلاً فَهَجَا الْقَبِيْلَةَ بِأَسْرِهَا وَرَجُلٌ انْتَفَى مِنْ أَبِيْهِ وَزَنَّى أُمَّه- ُ

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি সে যে কোন ব্যক্তির নিন্দা করল। অতঃপর সে (জওয়াবে) পুরো বংশের নিন্দা জ্ঞাপন করল এবং ঐ ব্যক্তি যে তার পিতৃ পরিচয় অস্বীকার করল। (অর্থাৎ পিতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল) এবং তার মাকে ব্যভিচারের অপবাদ দিল'। অন্য হাদীছে এসেছে, عَنْ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَام -

সা'দ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি অন্যকে নিজের পিতা বলে দাবী করে অথচ সে জানে যে সে তার পিতা নয়, জান্নাত তার জন্য হারাম'। অন্যত্র এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْر-

আবু হুরায়রা (রাঃ) সূত্রে নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা তোমাদের পিতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না (অর্থাৎ তাকে অস্বীকার করো না)। কারণ যে লোক নিজের পিতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় (অর্থাৎ পিতাকে অস্বীকার করা) তা কুফরী'।

হাদীছে আরো আছে,

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضى الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ-

আবু যার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, 'কোন লোক যদি নিজ পিতা সম্পর্কে অবগত থাকা সত্ত্বেও অন্য কাউকে তার পিতা বলে দাবী করে তবে সে আল্লাহকে অস্বীকার করল। আর যে ব্যক্তি নিজেকে এমন বংশের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে দাবী করল যে বংশের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নিল'।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিজের পিতাকে বাদ দিয়ে অন্য ব্যক্তিকে পিতা বলে পরিচয় দেয়, সে জান্নাতের সুবাসটুকুও পাবে না। অথচ সত্তর বছরের দূরত্ব থেকে জান্নাতের সুবাস পাওয়া যাবে'।

এসকল হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পিতা-মাতাকে অস্বীকার করা কবীরা গুনাহ, যার কারণে জান্নাত হারাম হয়ে যাবে। এজন্য পিতা-মাতা যে মর্যাদার অধিকারী হন, যে কর্ম বা যে পেশার হোন তাদেরকে যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করতে হবে এবং তাদের পরিচয় প্রদানে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হওয়া যাবে না।

পিতা-মাতার সাথে খারাপ আচরনের দুনিয়াবি পরিণতি

দুনিয়ায় ভয়াবহ পরিণতি:

পিতামাতার সাথে খারাপ আচরণ করলে বা কোনভাবে তাদের কষ্ট দিলে আল্লাহ তাকে পরকালে শাস্তি দিবেন। পাশাপাশি দুনিয়াতেও তার উপর দ্রুত শাস্তি নেমে আসবে। শাস্তির ধরন বিভিন্ন হতে পারে। যেমন জীবন ও জীবিকায় বরকত লাভ থেকে বঞ্চিত হওয়া। এছাড়াও কর্মে সফল না হওয়া ও মানসিকভাবে কষ্টে থাকা ইত্যাদি। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تُدْرِكَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، وَبَابَانِ مُعَجَّلَانِ عُقُوبَتُهُمَا فِي الدُّنْيَا الْبَغْبُ وَالْعُقُوقُ

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে লোক দু'টি মেয়ে সন্তানকে বালেগা হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করবে, আমি এবং সে এভাবে একসাথে পাশাপাশি জান্নাতে অবস্থান করব। এই বলে তিনি নিজের হাতের মধ্যমা ও তর্জনী অঙ্গুলী একত্রিত করে ইশারায় বুঝিয়ে দিলেন। আর পাপের দু'টি স্তর যার শাস্তি দুনিয়াতে দ্রুত প্রদান করা হয়। আর তা হ'ল ব্যভিচার ও পিতা-মাতার অবাধ্যতা'।

পিতা-মাতার অবাধ্যতায় বদনাম ছড়িয়ে পড়ে:

পিতা-মাতার খেদমত করা আবশ্যক। আল্লাহর নির্দেশ পালনের পরপরই পিতা-মাতার গুরুত্ব রয়েছে। প্রয়োজনে নফল ইবাদত ছেড়ে পিতা-মাতার ডাকে সাড়া দিতে হবে। তারা মনের কষ্টে একবার 'উহ' শব্দ করে বদদো'আ করলে আল্লাহ কবুল করে নিবেন। পূর্ব যুগে জনৈক ব্যক্তি মায়ের ডাকে সাড়া না দেওয়ার কারণে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। রাসূল (ছাঃ) সে ঘটনা বর্ণনা করার মাধ্যমে আমাদেরকে সতর্ক করে বলেছেন যে, মাকে কোনভাবেই অসন্তুষ্ট রাখা যাবে না।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, জুরাইজ (বনী ইসরাঈলের এক আবিদ) তার ইবাদতখানায় ইবাদতে মশগুল থাকতেন। (একবার) তাঁর মা: তাঁর কাছে এলেন। হুমাইদ (রহঃ) বলেন, আমাদের কাছে আবু রাফে' এমন আকারে ব্যক্ত করেন, যেমনভাবে রাসূল (ছাঃ) আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর কাছে ব্যক্ত করেছিলেন। সেই মায়ের ডাকার পদ্ধতি এবং যেভাবে তাঁর হাত তাঁর ভ্রূর উপর রাখছিলেন এবং তাঁর দিকে মাথা উচু করে তাকে ডাকছিলেন। তিনি বলছিলেন, হে জুরাইজ! আমি তোমার মা, আমার সাথে কথা বল। এই কথা এমন অবস্থায় বলছিলেন, যখন জুরাইজ ছালাতে মশগুল ছিলেন। তখন তিনি মনে মনে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ! (একদিকে) আমার মা আর (অপর দিকে) আমার ছালাত (আমি কী করি?)। রাবী বলেন, অবশেষে তিনি তাঁর ছালাতকে অগ্রাধিকার দিলেন এবং তার মা ফিরে গেলেন। পরে তিনি দ্বিতীয়বার এসে বললেন, হে জুরাইজ! আমি তোমার মা, তুমি আমার সঙ্গে কথা বল। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমার মা, আমার ছালাত। তখন তিনি তাঁর ছালাতেই মশগুল রইলেন। তখন তাঁর মা বললেন, হে আল্লাহ! এই জুরাইজ আমার ছেলে। আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছিলাম। সে আমার সঙ্গে কথা বলতে অস্বীকার করল। হে আল্লাহ! তার মৃত্যু দিয়ো না, যে পর্যন্ত না তাকে ব্যভিচারিণীদের দেখাও। তখন নবী করীম (ছাঃ) বলেন, যদি তার মাতা তার বিরুদ্ধে অন্য কোন বিপদের জন্য বদদো'আ করতেন তাহ'লে সে অবশ্যই সেই বিপদে পতিত হ'ত। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, এক মেষ রাখাল জুরাইজের ইবাদতখানায় (মাঝে মাঝে) আশ্রয় নিত। তিনি বলেন, এরপর গ্রাম থেকে এক মহিলা বের হয়েছিল। উক্ত রাখাল তার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। এতে মহিলাটি গর্ভবতী হয়ে পড়ে এবং একটি পুত্র সন্তান জন্ম দেয়। তখন লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করল, এই (সন্তান) কোথা থেকে? সে উত্তর দিল, এই ইবাদতখানায় যে বাস করে, তার থেকে। তিনি বলেন, এরপর তারা শাবল-কোদাল নিয়ে এল এবং চিৎকার করে তাকে ডাক দিল। তখন জুরাইজ ছালাতে মশগুল ছিলেন। কাজেই তিনি তাদের সাথে কথা বললেন না। তিনি বলেন, এরপর তারা তার ইবাদতখানা ধ্বংস করতে লাগল। তিনি এ অবস্থা দেখে নীচে নেমে এলেন। এরপর তারা বলল, এই মহিলাকে জিজ্ঞেস কর (সে কি বলছে)। তিনি বলেন, তখন জুরাইজ মুচকি হেসে শিশুটির মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, তোমার পিতাকে? তখন শিশুটি বলল, আমার পিতা সেই মেষ রাখাল। যখন তারা সে শিশুটির মুখে একথা শুনতে পেল তখন তারা বলল, আমরা তোমার ইবাদতখানার যেটুকু ভেঙ্গে ফেলেছি তা সোনা-রূপা দিয়ে পুনঃনির্মাণ করে

দেব। তিনি বললেন, না; বরং তোমরা মাটি দ্বারাই পূর্বের ন্যায় তা নির্মাণ করে দাও। এরপর তিনি তার ইবাদতগাহে উঠে গেলেন'।

উক্ত হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, নফল ইবাদতের চেয়ে পিতা-মাতার খেদমত করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। নফল ইবাদত করার সময় পিতা-মাতা কোন কাজে আহ্বান করলে তা পরিত্যাগ করে তাদের ডাকে সাড়া দিতে হবে। তবে ফরয ইবাদতে বা ছালাতে থাকলে ছালাত সংক্ষিপ্ত করে পিতা-মাতার ডাকে সাড়া দিতে হবে।

পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাসূল (ছাঃ) ও জিব্রাঈলের বদদো'আ :

যে ব্যক্তি পিতামাতার সাথে অসদাচরণ করে তার প্রতি আল্লাহতো অসন্তুষ্ট হন। স্বয়ং রাসূল (ছাঃ) ও জিব্রাঈল (আঃ) এদের বিরুদ্ধে বদদো'আ করেছেন। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ. قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, তার নাক ধূলায় ধূসরিত হৌক (৩ বার)। বলা হ'ল, তিনি কে হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা উভয়কে কিংবা একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেল, অথচ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না'।

কা'ব বিন উজরা হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা মিম্বর উপস্থিত করো। আমরা তা উপস্থিত করলাম। তিনি মিম্বরে আরোহণ করলেন। অতঃপর প্রথম সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন। দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন। এরপর তৃতীয় সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন। বক্তব্য শেষে মিম্বর থেকে নামলে আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনাকে এমন কিছু বলতে শুনলাম যা ইতিপূর্বে শুনেনি। তিনি বললেন, আমি যখন প্রথম সিঁড়িতে উঠলাম, তখন জিব্রীল (আঃ) আমাকে এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ! যে ব্যক্তি রামাযান মাস পেল, অথচ তাকে

ক্ষমা করা হ'ল না। (পরে সে জাহান্নামে প্রবেশ করল। আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন)। তুমি বল, আমীন। তখন আমি বললাম, আমীন। অতঃপর দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা দিলে তিনি বললেন, যার নিকটে তোমার নাম উচ্চারিত হ'ল, অথচ সে তোমার উপরে দরূদ পাঠ করল না। (অতঃপর মারা গেল ও জাহান্নামে প্রবেশ করল। আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন।) তুমি বল, আমীন। তখন আমি বললাম, আমীন। তৃতীয় সিঁড়িতে উঠলে জিব্রীল (আঃ) বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বা তাদের একজনকে বৃদ্ধ/বৃদ্ধা অবস্থায় পেল অথচ তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারল না। সে ধ্বংস হোক। অর্থাৎ সে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করল না (ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করল, আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন)। আর পিতা-মাতাকে সম্মান করার অর্থ হ'ল আল্লাহ তা'আলাকে সম্মান করা।এজন্য আল্লাহ তা'আলা তাদের (পিতা-মাতা) প্রতি সদ্ব্যবহার করা ও সম্মানজনক আচরণ করা তার একত্ববাদ ও ইবাদতের সাথে সংশ্লিষ্ট করেছেন, যেমন ، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا , পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো' (ইসরা ১৭/২৩)।

পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তির উপর দ্রুত শাস্তি আগমন:

পিতা-মাতা সব থেকে নিকটতম আত্মীয়। তাদের সাথে কোন সময় সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে না বা কোন খারাপ আচরণ করা যাবে না। তা করলে আল্লাহ দুনিয়ায় দ্রুত শাস্তি প্রদান করার পাশাপাশি আখিরাতেও শাস্তি দিবেন। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا مِنْ ذَنْب أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ

আবু বাকরা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, (ন্যায়পরায়ণ শাসকের বিরুদ্ধে) বিদ্রোহ ও রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার মতো মারাত্মক আর কোন পাপ নেই, আল্লাহ তা'আলা যার সাজা পৃথিবীতেও প্রদান করেন এবং আখিরাতের জন্যও অবশিষ্ট রাখেন'। অর্থাৎ দু'টো পাপ ছাড়া আর অন্য কোন পাপই এত অধিক অপরাধ যোগ্য নয় যা সম্পাদনকারীকে দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ্ আযাবে

নিপতিত করতে পারে। তার প্রথমটি হ'ল: শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। এটি একটি যুলুম। সমকালের স্থিতিশীল সুলতান/শাসক বা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে রাষ্ট্রকে অস্থিতিশীল করে জনগণকে নিরাপত্তাহীন করে তোলা এবং সরকারকে বিব্রত করে তোলা ভয়াবহ অপরাধ। আল্লাহ তা'আলা এ অপরাধের শাস্তি তাকে দুনিয়াতেও দিবেন এবং তওবা না করে মৃত্যুবরণ করলে আখেরাতেও তার জন্য ভয়াবহ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। দ্বিতীয় অপরাধ বা পাপটি হ'ল আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা। এর মধ্যে সর্বাধিক নিকটতম আত্মীয় হ'লেন পিতা-মাতা। যাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে আল্লাহ তা'আলা বেশী নারায হন।

পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তি অভিশপ্ত :

যে ব্যক্তি পিতা-মাতার অবাধ্য হয়, তাদের আদেশ-নিষেধ অমান্য করে এবং তাদের সাথে খারাপ আচরণ করে তারা অভিশপ্ত। হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَلْعُوْنَ مَنْ عَقَّ وَالِدَيْه -

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি পিতা-মাতার অবাধ্যতা করল সে অভিশপ্ত'। আর এই অভিশাপ আল্লাহ, তাঁর রাসূল, ফেরেশতাকুল এবং সকল সৃষ্টি জগতের পক্ষ থেকে। যে ব্যক্তি অভিশপ্ত হয় সে সবার কাছে ঘৃণার পাত্র।

পিতামাতার সাথে খারাপ আচরনের পরকালের পরিণতি:

পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তি দুনিয়াতে বিভিন্ন ধরনের মানসিক ও শারীরিক শাস্তি পাওয়ার পাশাপাশি আখিরাতেও শাস্তি পাবে। কিছু পাপ রয়েছে যেগুলোর শাস্তি দুনিয়াতে হয়ে গেলে পরকালে হয় না। কিন্তু পিতা-মাতার অবাধ্যতা এত বড় পাপ যে, দুনিয়াতে এর শাস্তি হয়ে গেলেও ক্ষমা পাবে না। পরকালে আবার এর শাস্তি পেতে হবে। এই শাস্তি বিভিন্ন ধরনের হ'তে পারে। জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়া, আল্লাহ্র রহমতের দৃষ্টি না পড়া, নবী-রাসূল, ছিদ্দীকীন ও শুহাদাদের সঙ্গ না পাওয়া, ইবাদত কবুল না হওয়া ইত্যাদি।

পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না:

পিতামাতার অবাধ্য ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না। ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ، وَالدَّيُّوْثُ. وَثَلَاثَةٌ لا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ : الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ، وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى-

আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, মহান আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর ব্যক্তির প্রতি (রহমতের) দৃষ্টি দিবেন না। তারা হচ্ছে, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, পুরুষের বেশ ধারণকারী নারী ও বাড়ীতে বেহায়াপনার সুযোগ প্রদানকারী পুরুষ (দাইয়ূছ)। আর তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তারা হচ্ছে, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, সর্বদা মদ্য পানকারী ও দান করে খোঁটা দানকারী'।

পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তি শহীদ, ছিদ্দীক ও নবীগণের সঙ্গী হওয়া থেকে বঞ্চিত হবে:

একজন মুসলমান যাবতীয় ইবাদত পালন করলেও পিতা-মাতার অবাধ্যতা করলে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، شَهِدْتُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، وَصَلَّيْتُ الْخَمْسَ، وَأَدَّيْتُ زَكَاةَ مَالِي، وَصُمْتُ شَهْرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : مَنْ مَاتَ عَلَى هَذَا كَانَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَكَذَا وَنَصَبَ إِصْبَعَيْهِ مَا لَمْ يَعُقَ وَالِدَيْهِ

আমর ইবনু মুরা আল-জুহানী হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আগমন করে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সাক্ষ্য দেই যে আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আপনি আল্লাহ্র রাসূল, আমি পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করি, আমার সম্পদের যাকাত দেই, রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, যে ব্যক্তি এর উপরে (এরূপ কথা ও আমলের উপর) মৃত্যুবরণ করবে সে ক্বিয়ামতের দিন নবীগণ, ছিদ্দীক ও শহীদগণের সাথে অবস্থান করবে। যদি না সে পিতা-মাতার অবাধ্যতা করে'-এভাবে তিনি তার আঙ্গুল দাঁড় করালেন'।

পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তির ফরয বা নফল কোন ইবাদত কবুল হবে না:

পিতা-মাতার অবাধ্যতা এমন মহাপাপ যে, এই ধরনের অপরাধের সাথে জড়িত থাকলে কোন প্রকারের ইবাদত আল্লাহর নিকট কবুল হবে না। হাদীছে এসেছে,

عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاً ولا عَدْلاً عَاقٌ وَمَنَّانٌ ومُكَذِّبٌ بِالْقَدَر-

আবু উমামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির ফরয ও নফল কোন ইবাদত আল্লাহ কবুল করবেন না। পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, দান করে খোঁটাদানকারী ব্যক্তি ও তাকদীরকে অস্বীকারকারী'।

যার ইবাদত কবুল হবে না তার জান্নাত পাওয়ার প্রশ্নই আসে না। তবে আল্লামা তুরিবিশতী (রহঃ) বলেন, যারা এ ধরনের পাপের সাথে জড়িত থাকবে তারা জান্নাতে যাবে না- এর অর্থ হ'ল, প্রথম সারির সফলকামদের সাথে জান্নাতে যাবে না অথবা জান্নাতে যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত এ জঘন্য পাপের শাস্তি ভোগ না করবে।

পিতা-মাতার অবাধ্যতার কারণে জাহান্নামী ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাসূল (ছাঃ)-এর বদদো'আ :

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أُبَيِّ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا ثُمَّ دَخَلَ النَّارَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَأَسْحَقَه- ُ

উবাই বিন মালেক হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি পিতা-মাতা উভয়কে বা একজনকে জীবিত অবস্থায় পেল তারপরেও জাহান্নামে প্রবেশ করল। আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুন এবং তাঁর রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিন'।

পিতা-মাতার প্রতিদান:

পিতা-মাতা যে কষ্ট করে সন্তান লালন-পালন করেন, তার প্রতিদান কেউ দিতে পারে না। এমনকি মায়ের এক ফোটা দুধের ঋণ পরিশোধ করাও অসম্ভব। গর্ভকালীন একটি দীর্ঘ শ্বাসের বিনিময়ও কোন সন্তান দিতে পারবে না। কিন্তু ভালোর প্রতিদান ভালো কাজ দিয়ে হওয়া উচিৎ। আল্লাহ বলেন هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَان ُ উত্তম কাজের প্রতিদান উত্তম ছাড়া আর কি হ'তে পারে? (আর-রহমান ৫৫/৬০)।

দাসত্ব বরণকারী পিতাকে মুক্ত করলেও পিতা-মাতার অধিকার আদায় হবে না। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم: لَا يَجْزِى وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَه- ُ

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সন্তানের পক্ষে তার পিতাকে প্রতিদান দেয়া সম্ভব নয়। তবে সে তাকে দাসরূপে পেয়ে ক্রয় করে দাসত্বমুক্ত করে দিলে তার প্রতিদান হ'তে পারে'।

অন্য হাদীছে এসেছে,

وَعَنْ أَبِي بُرْدةَ قَالَ : شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما وَرَجُلٌ يَمَانِيٌّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ قَدْ حَمَلَ أُمَّهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ، يَقُوْلُ: إِنِّي لَهَا بَعِيرُهَا الْمُذَلَّل ... إِنْ أُذْعِرَتْ رِكَابُهَا لَمْ أَذْعَرْ ثُمَّ قَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ أَتَرَانِي جَزَيْتُها؟ قَالَ: لَا، وَلَا بِزَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ

আবু বুরদা (রহঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি ইবনে ওমর (রাঃ)-এর সাথে ছিলাম। ইয়েমেনের এক ব্যক্তি তার মাকে তার পিঠে বহন করে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করছিল আর বলছিল, 'আমি তার জন্য তার অনুগত্য উটতুল্য। আমি তার পাদানিতে আঘাতপ্রাপ্ত হ'লেও নিরুদ্বেগে তা সহ্য করি'। অতঃপর সে ইবনে ওমর (রাঃ)-কে বলল, আমি কি আমার মাতার প্রতিদান দিতে পেরেছি বলে আপনি মনে করেন? তিনি বলেন, না, তার একটি দীর্ঘশ্বাসের প্রতিদানও হয়নি'।
অন্য বর্ণনায় এসেছে,

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَأَى رَجُلًا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ حَامِلا أُمَّهُ، وَهُوَ يَقُولُ : أَتَرَيْنِي جَزَيْتُكَ يَا أُمَّهُ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَيْ لُكَعُ وَلَا طَلْقَةً وَاحِدَةً -

হাসান হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা ইবনু ওমর (রাঃ) দেখলেন, জনৈক ব্যক্তি তার মাকে কাঁধে নিয়ে বায়তুল্লাহ তাওয়াফকালীন সময়ে বলছে, হে মা! তুমি কি মনে কর আমি তোমার প্রতিদান দিতে পেরেছি? ইবনু ওমর (রাঃ) একথা শুনে বললেন, হে নগণ্য! জন্মের সময়কার একটি কষ্টেরও নয়'।

আরেকটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ وَمَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে নিরাপত্তা চায়, তাকে নিরাপত্তা দাও। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ নামে ভিক্ষা চায়, তাকে দাও। যে ব্যক্তি তোমাদেরকে দাওয়াত করে তার ডাকে সাড়া দাও। যে ব্যক্তি তোমাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে তোমরা তার উত্তম প্রতিদান দাও। প্রতিদান দেয়ার মতো কিছু না পেলে তার জন্য দু'আ করতে থাকো, যতক্ষণ না তোমরা অনুধাবন করতে পারো যে, তোমরা তার প্রতিদান দিতে পেরেছো।

পিতা-মাতার মাঝে দ্বন্দ্ব লাগলে সন্তানের করণীয়:

পিতা-মাতা সন্তানের নিকট সমমর্যাদার অধিকারী। যদিও সেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে মা অগ্রাধিকারযোগ্য। বর্তমান অনৈসলামিক সমাজ ব্যবস্থায় দেখা যায় পিতা ও মাতার মধ্যে মনোমালিন্য লেগেই থাকে। এমনকি তারা সন্তানের সামনে উচ্চ ভাষায় পরস্পরকে গালিগালাজ করে এবং হাতাহাতিও করে। আর এর কারণ হ'ল শয়তান স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারলে খুব খুশী হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزَلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ قَالَ: فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ শয়তান সমুদ্রের পানির উপর তার সিংহাসন স্থাপন করে। অতঃপর মানুষের মধ্যে ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি করার জন্য সেখান থেকে তার বাহিনী চারদিকে প্রেরণ করে। এদের মধ্যে সে শয়তানই তার নিকট সর্বাধিক সম্মানিত যে শয়তান মানুষকে সবচেয়ে বেশী ফিৎনায় নিপতিত করতে পারে। তাদের মধ্যে একজন ফিরে এসে বলে, আমি এরূপ এরূপ ফিৎনা মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করেছি। তখন সে (ইবলীস) প্রত্যুত্তরে বলে, তুমি কিছুই করনি। তিনি বলেন, অতঃপর এদের অপর একজন এসে বলে, আমি মানব সন্তানকে ছেড়ে দেইনি, এমনকি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ করে দিয়েছি। তিনি বলেন, শয়তান এ কথা শুনে তাকে নিকটে বসায়

আর বলে, তুমিই উত্তম কাজ করেছ। বর্ণনাকারী আ'মাশ বলেন, আমার মনে হয় জাবের (রাঃ) এটাও বলেছেন যে, অতঃপর ইবলীস তার সাথে আলিঙ্গন করে'।

এক্ষেত্রে সন্তানের দায়িত্ব হ'ল নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিষয়গুলো অবলোকন করে উভয়কে নিজেদের ভুলের ব্যাপারে সচেতন করা এবং বুঝিয়ে তাদের মাঝে মীমাংসা করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর যখন তোমরা কথা বলবে তখন ন্যায় কথা বলবে, তা নিকট জনের বিরুদ্ধে হলেও' (আন'আম ৬/১৫২)। তিনি আরো বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হিসাবে, যদিও সেটি তোমাদের নিজেদের কিংবা তোমাদের পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে যায়' (নিসা ৪/১৩৫)। এক্ষণে তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেওয়া সদাচরণের অংশ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 'মুমিনগণ পরস্পরে ভাই ব্যতীত নয়। অতএব তোমাদের দু'ভাইয়ের মধ্যে সন্ধি করে দাও। আর আল্লাহকে ভয় কর। তাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে' (হুজুরাত ৪৯/১০)। আর মীমাংসা করে দেওয়ার কাজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি না করলে পিতা-মাতার মাঝে বিচ্ছেদ ঘটতে পারে, যা সন্তানের জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক হবে। রাসূল (ছাঃ) মীমাংসা করার গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে বলেন, أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ ، قَالُوا: بَلَى، قَالَ: صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ আমি তোমাদেরকে (নফল) ছিয়াম, ছালাত ও ছাদাক্বা অপেক্ষাও উত্তম আমলের কথা বলব না? ছাহবীগণ বললেন, অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন, বিবদমান দু'ব্যক্তির মাঝে সুসম্পর্ক স্থাপন করা। কেননা পরস্পর সম্পর্ক বিনষ্ট করা হ'ল দ্বীন ধ্বংসকারী বিষয়'।

এছাড়াও সন্তান নিম্নের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে পারে-

১. সন্তান পিতা-মাতার মীমাংসার জন্য দো'আ করবে। আর দো'আ করার জন্য দো'আ কবুলের সময়গুলো বেছে নিবে; সেটি হতে পারে সিজদায়, শেষ রাতে বা ফরয ছালাত শেষে।

২. পিতা ও মাতা উভয় বংশের মধ্য হতে দু'জন বিচারক নিয়োগ করা যাতে তারা তাদের মাঝের মতপার্থক্য দূর করে সমঝোতায় উপনীত হতে পারে। আর আশা রাখবে আল্লাহ যাতে এদের মাধ্যমে মীমাংসা করে দেন।

৩. পিতা-মাতা উভয়কে ক্ষমা করার গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে অবহিত করা। যাতে তারা পরস্পরকে ক্ষমা করে পরস্পরের প্রতি সহনশীল ও সহমর্মী হয়। আল্লাহ বলেন, وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير 'তবে মাফ করে দেওয়াটাই তাক্বওয়ার অধিক নিকটবর্তী। তোমরা পরস্পরের প্রতি সদাচরণকে ভুলে যেয়ো না (বাক্বারাহ ২/২৩৭)। আল্লাহ আরো বলেন, তারা যেন তাদের মার্জনা করে ও দোষ-ত্রুটি এড়িয়ে যায়। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করেন? বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াবান (নূর ২৪/২২)।

৪. পিতা-মাতাকে সম্পর্ক ছিন্ন করার ভয়াবহতা সম্পর্কে অবহিত করবে। অবহিত করবে পরস্পরকে পরিত্যাগ করার ভয়াবহতা সম্পর্কে।

৫. পিতা-মাতাকে পারস্পরিক ভালো ধারণা সম্পর্কে অবহিত করবে। পিতার নিকট মায়ের অনুশোচনা সম্পর্কে অবহিত করবে এবং মায়ের নিকট পিতার অকৃত্রিম ভালো থাকার কথা অবহিত করবে যদিও তা মিথ্যা হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا 'সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়, যে মানুষের মধ্যে মীমাংসা করার জন্য (নিজের থেকে) ভালো কথা পৌঁছে দেয় কিংবা ভালো কথা বলে'।

২য় অধ্যায়

মা-বাবার সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক:

মা-বাবার সঙ্গে একটি শিশুর নিবিড় সম্পর্ক থাকে। কারণ, তারা হলো সন্তানের নিকট নিরাপদ আশ্রয়, শক্তির উৎস এবং বিশুদ্ধতার প্রতীক। অতএব একটি শিশু কখনো কোন বিপদের আশঙ্কা করলে তার মা-বাবার নিকট আশ্রয় নেয়। সে বিশ্বাস করে, যে কোন কাজ সম্পাদন করার শক্তি ও সামর্থ্য তাদের রয়েছে। তাদের গৃহীত সিদ্ধান্ত, তাদের কথা ও কর্মসমূহ বিশুদ্ধতার মাপকাঠি। সুতরাং মা-বাবার, বিশেষ করে বাবার কখনোই কঠিন মুহূর্তে কোন ভয় কিংবা দুর্বলতা প্রকাশ করা উচিত নয়। যেমনিভাবে কোন পদক্ষেপ গ্রহণে তার বিস্ময় ও ইতস্ততা করা উচিত নয়। কারণ, এগুলো শিশুর ব্যক্তিত্বে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

এ পর্যায়ে মা-বাবা তাদের ইচ্ছানুযায়ী একটি শিশুকে সুন্দর আচার-ব্যবহারে সুশোভিত করে গড়ে তুলতে প্রয়াস পাবেন। বাসস্থান, বস্ত্র ও পানাহরের প্রাচুর্য্য অথবা হৃদয়, আত্মা ও বুদ্ধিকে উপেক্ষা করে শুধু স্বাস্থ্য, শরীর ও পরিচ্ছন্নতার মধ্যে তাদের তৎপরতা সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। কারণ, পর্যাপ্ত পানীয় ও আহার্য যোগানের দায়িত্ব সংক্ষিপ্তভাবে সমস্ত সৃষ্টিই করে থাকে। সমগ্র সৃষ্টিকুলের ওপর মানবজাতির স্বাতন্ত্র ও অনন্য বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠিত।

সন্তান পরিচর্যার ক্ষেত্র

ক-দেহ পরিচর্যা: অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের সংস্থান হতে হবে হালাল উপার্জন দ্বারা। সাথে সাথে যত্নবান হতে হবে সন্তানের স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা ও বিনোদনের প্রতি। এ ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করতে হবে মা-বাবাকে।ফকিহ সিরাজী রহ. শিশুর এই পরিচর্যার দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, 'পশুর দুধে শিশুর পরিচর্যা তার স্বভাবকে ধ্বংস করে দেয়।'

ইমাম গাজ্জালী রহ. বিষয়টির প্রতি সবিশেষ গুরুত্বারোপ করে বলেন, 'ধর্মানুরাগী এবং হালাল ভক্ষণকারী নয় এমন কোন মহিলাকে যেন শিশুর লালন-পালন ও দুগ্ধপানের

জন্যে নিয়োগ দেওয়া না হয়। কারণ হারাম থেকে লব্ধদুধের মধ্যে কোন বরকত থাকে না। সুতরাং এর থেকে শিশুর যে শারীরিক বিকাশ-সেটা হবে দুষ্টমূল থেকে তার গঠন। তখন তার স্বভাব দুষ্টুমি ও অপবিত্র বিষয়ের দিকে ঝুঁকে পড়বে।' তিনি আরো বলেন, 'এবং দিনের কোন এক ভাগে তাকে হাঁটানো, নড়া-চড়া ও শরীর চর্চায় অভ্যস্ত করতে হবে, যাতে অলসতা কখনো তার ওপর ঝেকে বসতে না পারে।'

খ- হৃদপিণ্ড বা অন্তরের পরিচর্যা:

বিশুদ্ধ বিশ্বাস এবং সুদৃঢ় ঈমানের আলোকে অন্তরকে উদ্ভাসিত করা। ইমাম গাজ্জালী রহ. তার বক্তব্যে এই দিকেই ঈঙ্গিত করেন-শিশুদেরকে 'কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান আহরণ করাবেন। অধ্যয়ন করাবেন আউলিয়ায়ে কেরামের জীবনী ও আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের ঘটনাবলী। যাতে নেককারদের প্রতি ভালোবাসা তার অন্তরে অংকুরিত হয়ে থাকে।'

গ- আত্মার পরিচর্যা:

এটা অর্জিত হবে নান্দনিক চরিত্র ও ভালো আচরণের দিকে আহ্বান, শরিয়ত কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব ও ইবাদতের প্রতি যত্নবান হওয়া এবং আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে।
এ প্রসঙ্গে ইমাম গাজ্জালী রহ. বলেন, 'শিশু হচ্ছে মা-বাবার নিকট আল্লাহ প্রদত্ত একটি আমানত। তার পবিত্র আত্মা যে কোন ছবি ও অংকন থেকে মুক্ত, নির্মল ও উৎকৃষ্ট একটি রত্ন। সেখানে যা অংকিত হবে তাই সে গ্রহণ করতে সক্ষম। যে দিকে তাকে আকৃষ্ট করা হবে সে দিকেই সে ধাবমান হবে। সুতরাং যদি কল্যাণকর বিষয় বা শিষ্টাচার শিক্ষা ও এর ওপর তাকে অভ্যস্ত করা হয় তাহলে এভাবেই সে গড়ে উঠবে। সৌভাগ্য তার পদচুম্বন করবে ইহ ও পরলোকে। সে সফলতা ও পুরুস্কারে অংশীদার তার মা-বাবা এমনকি শিক্ষকবৃন্দও। পক্ষান্তরে যদি তাকে -আল্লাহ না করুন- চতুস্পদ জন্তুর মত ছেড়ে দিয়ে অকল্যাণ ও মন্দের ওপর অভ্যস্ত করা হয়, তাহলে সে হবে ব্যর্থমনোরথ ও হতভাগ্য। তখন এর দায়ভার সন্তানের লালন-পালনের দায়িত্বপ্রাপ্ত অভিভাবকদের কাঁধে গিয়ে পড়বে।

আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেন-

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. (التحريم(6)

'হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের এবং পরিবার পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা কর....

একজন পিতা যখন তার সন্তানকে জাগতিক অগ্নি থেকে রক্ষা করতে সদা তৎপর থাকে, তখন পরকালের অগ্নি হতে তাকে রক্ষা করতে আরো বেশি সচেষ্ট ও তৎপর হওয়া দরকার। সচ্চরিত্র, শিষ্টাচার ও ভদ্রতা শিক্ষাদান এবং দুষ্ট সঙ্গ হতে নিবৃত করা- এসবের মাধ্যমেই প্রকৃত পক্ষে সন্তানকে অগ্নি হতে রক্ষার প্রতিফলন ঘটবে। সন্তান পরিচর্যার উল্লেখিত ক্ষেত্রদ্বয়ে কর্তব্য পালনে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, মসজিদের ইমাম ও মা-বাবা সকলে সমভাবে জড়িত।

গ- বুদ্ধির পরিচর্যা:

সঠিক স্বপ্ন, নির্ভুল পরিকল্পনা, চিন্তা-গবেষণা, প্রমাণ উপস্থাপনের পদ্ধতি, কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রাথমিক ভূমিকা থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে চূড়ান্ত ফলাফল বের করার পদ্ধতি, জ্ঞানগত দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা, গবেষণাধর্মী তৎপরতায় অংশগ্রহণ এবং পার্থিব উপকারী তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে মূখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ।

সন্তানের অধিকার

শিশুদের দায়িত্বাবলী সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পালন এবং তাদের অধিকারসমূহের হক আদায়ে যে উচ্চাঙ্গের নৈতিক চরিত্র ও গুণাবলীর প্রয়োজন তা আল্লাহ পাক নিজের হিকমতের অধীন পুরুষদের তুলনায় মহিলাদেরকেই কিছুটা বেশী দান করেছেন। ধৈর্য, ত্যাগ ও কুরবানী, দয়া ও নম্রতা এবং ভালোবাসার মৌলিক গুণাবলী পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের বেশী দান করা হয়েছে। আর এজন্যই তাদের উপর আল্লাহ পাক যেসব দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তা পালনের জন্য ঐসব গুণাবলীর বেশী প্রয়োজন।

সন্তানের ৭টি অধিকার

এক: সন্তানের কদর ও মূল্য

দুইঃ লালন-পালন

তিন: সুন্দর আচরণ

চার : ভালো নাম রাখা

পাঁচ: স্নেহ ও ভালোবাসা

ছয়: শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং

সাত: বিয়ে।

সন্তানের কদর ও মূল্য

সন্তানের প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হলো তার প্রতি আপনার মর্যাদা ও মূল্যের অনুভূতি থাকা। তার অস্তিত্বকে জীবনের মুসিবত মনে করে বিরক্ত হওয়া উচিত নয়। বরং সন্তানকে নিজের জন্য আল্লাহর রহমাত ও পুরস্কার মনে করা প্রয়োজন। আপনি যদি তার অস্তিত্বের মূল্য দিতে সফল না হন তাহলে তার অন্যান্য অধিকার কখনই আদায় করতে পারবেন না অথবা অন্যান্য অধিকার আদায়ের সুযোগই আপনি দেবেন না অথবা এ সুযোগ এলেও আপনি অধিকার আদায়ে সফল হতে পারবেন না।

সন্তানের সাথে সঠিক আচরণের জন্য তার সঠিক মর্যাদা ও মূল্য জানা অতি আবশ্যকীয় ব্যাপার। সন্তান আল্লাহর মহান নেয়ামত। সন্তান ঘরের শোভা, খায়ের ও বরকত এবং দীন-দুনিয়ার কল্যাণের সমান। সন্তান দুনিয়ায় আপনার মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করে এবং

জীবনের সাহারা বা সাহায্যকারী হিসেবে বিবেচিত। আপনার আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে। আপনার প্রিয় ধ্যান-ধারণা বা আদর্শের সংরক্ষণ ও প্রচারের মাধ্যম হয়। আপনার প্রতিষ্ঠিত নিয়ম-প্রথাকে সে অব্যাহত রাখে এবং আপনার উত্তরাধিকার হয়ে পরবর্তীতে সে আপনার কীর্তিকে জীবিত রাখে।

দীনি দৃষ্টিকোণ থেকেও সন্তান আল্লাহর নজীরবিহীন পুরস্কার। দীনি কাজে সে আপনার উত্তম সাহায্যকারী ও উত্তরাধিকার। দীনি কাজের জবাবদিহিতে সে আপনার চক্ষু শীতলকারী ও অন্তরের শান্তি। আপনার দীনি প্রথা ও আদর্শের সংরক্ষক এবং উত্তরাধিকার। এজন্যেই আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নিকট দোয়া করেন:

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَة- ً

"হে আমার আল্লাহ! তুমি তোমার নিকট থেকে আমাকে পবিত্র সন্তান দান করো।"

এ দোয়ার একটি উদ্দেশ্য ছিলো। তাহলো, সন্তান তার পর দীনি উত্তরাধিকার হবে এবং পিতার মিশন পূর্ণ করবে।

فَهَبْ لِي مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا - يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوب- َ

"(হে আমার রব) তুমি তোমার নিকট থেকে আমাকে একজন উত্তরাধিকার দান করো। এ উত্তরাধিকার আমার ওয়ারিসও হবে এবং ইয়াকুবের পরিবারের মিরাসও পাবে।"

অর্থাৎ ইয়াকুব আলাইহিস সালামের পরিবার থেকে দীনের যে আলো প্রসারিত হয়েছিলো তার ওয়ারিস হবে এবং সে আলো কখনো নির্বাপিত হতে দেবে না। সত্য কথা হলো, নেক সন্তান দুনিয়াতেও বিরাট মান-ইজ্জতের মাধ্যম এবং আখেরাতেও অফুরন্ত সওয়াব ও পুরস্কারের মাধ্যম হয়ে থাকে।

আপনার জীবদ্দশায় যদি সন্তানের মৃতু্য হয় এবং আপনি সে মৃত্যু শোক সবর ও ধৈর্যের সাথে বরদাশত করেন তাহলে সন্তান আপনার জন্য আখেরাতের সঞ্চয়,

জান্নাতের ওসিলা এবং বিরাট মান-ইজ্জতের মাধ্যম হবে। এ সবরের বিনিময়ে আল্লাহ আপনাকে জান্নাত প্রদান করবেন এবং সেখানে আপনার জন্য একটি বিশেষ ধরনের মহল তৈরি করবেন। সে মহলের নামই হবে "শোকরের মহল।" হযরত আবু মূসা আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيَقُولُ قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فَيَقُولُ فَمَاذَا قَالَ عَبْدِي فَيَقُولُونَ حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وسموه بيت الحمد - جامع ترمذي

"যখন কোনো বান্দার সন্তান মারা যায় তখন আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের জিজ্ঞেস করেন, তোমরা আমার বান্দার সন্তানের রূহ কবজ করে নিয়েছো। ফেরেশতারা জবাব দেন জ্বী হাঁ। কবজ করে নিয়েছি। এরপর আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন তোমরা তার কলিজার টুকরার রূহ কবজ করেছো! ফেরেশতারা জবাব দেন জ্বী হাঁ, কবজ করেছি। এ সময় আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, অতপর আমার বান্দাহ কি বলেছে? ফেরেশতারা জবাব দেন, (পরওয়ারদিগার) তোমার বান্দা তোমার প্রশংসা করেছে। এবং এ মুসিবতে সে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়েছে। একথা শুনে আল্লাহ পাক ফেরেশতাদেরকে তার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি মহল তৈরির এবং সে মহলের নাম "শোকরের মহল" রাখার নির্দেশ দেন।"

সন্তানের প্রতিপালন

পার্থিব জীবনে মানুষের বয়োঃস্তর দু'টো বিস্তৃত অধ্যায়ে বিভক্ত।

প্রথমত, অদৃশ্য ও স্বভাবজাত স্তর তা হচ্ছে- মাতৃগর্ভে অবস্থানকালীন স্তর- শুক্রবিন্দু থেকে জমাটবাঁধা রক্ত, সেখান থেকে মাংসপিণ্ড অতঃপর অস্থিমজ্জা এবং তা গোস্ত দ্বারা আবৃত করণ, অত:পর একটি পূর্ণাঙ্গ ভ্রূণ এবং তার জন্ম গ্রহণ।

দ্বিতীয়ত. দৃশ্যমান স্তর তা হলো জন্ম গ্রহণের পরের স্তর। এটাকেও আবার বড় দু'টি স্তরে বিভক্ত করা সম্ভব।

ক- শৈশব স্তর: জন্ম থেকে বয়োপ্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত সময়।

খ- বয়োপ্রাপ্তি স্তর: যার সূচনা বয়সের পূর্ণতা প্রাপ্তি থেকে, এবং সমাপ্তি ঘটে মানব মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। যাতে সে পারলৌকিক জীবনের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে পারে, কবর যার প্রথম মনযিল।

শৈশব এবং বয়োপ্রাপ্তি এ দু'স্তরের মধ্যে আরো একটি প্রকরণ লক্ষ করা যায়। মূল কথা একজন মানুষের পরকালের দিকের এই দীর্ঘ ভ্রমণে তাকে এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উপনীত হতে হয়। এবং প্রত্যেকটি স্ত রেই তাকে বিশেষ প্রস্তুতি ও পরিচর্যার মুখোমুখী হতে হয়। সে কারণেই মানব বয়সের অগ্রগতির ধারা প্রবাহের সঙ্গে প্রতিপালন ও পরিচর্যার স্তর বিন্যাস ওৎপ্রোতভাবে জড়িত।

পরিচর্যার স্তর বিন্যাসের তিন ভাগে বিভক্ত-

ক- ভালোমন্দ পার্থক্য নির্ণয়-অযোগ্য শৈশবকাল: এটা সাধারণত জন্মের পর থেকে সাত বছর পূর্ণ হওয়া বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

খ- ভালোমন্দ পার্থক্য নির্ণয়যোগ্য শৈশবকাল: এটা সাধারণত সাত বছর থেকে বয়োপ্রাপ্তি অথবা পনের বছরের পূর্ব পর্যন্ত। প্রকাশ থাকে যে, উল্লেখিত প্রথম এবং মধ্যম স্তরও এই স্তরেরই অন্তর্ভুক্ত।

গ- বয়সের পূর্ণতাপ্রাপ্তি কাল সেটা হল পুরুষ বা নারীত্বের চিহ্নসমূহ প্রকাশ ও শরিয়তের আদেশ ও নিষেধ বাধ্যতামূলক হওয়ার স্তর। এর সূচনা হয় বয়োপ্রাপ্তি হওয়ার জ্ঞাত নিদর্শনসমূহ প্রকাশ অথবা পনের বছরে উপনীত হওয়ার পর।

এ বয়স উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরের বিপরীত। আলোচ্য প্রকারটি কুরআনে কারীমের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। যেখানে ভালোমন্দ নির্ণয় করতে পারে না এমন শৈশবকেই বুঝানো হয়েছে।

أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ . (النور31 -

সেই বালক, যারা নারীদের গোপনাঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ....।'' আয়াতখানা অবতীর্ণ হয়েছে মহিলাদের সৌন্দর্য্য অবলোকন ও প্রবেশাধিকার যাদের জন্য স্বীকৃত তাদের সম্পর্কে।

ইবনে কাসির রহ. বলেন, 'তারা নেহায়েত ছোট বলে মহিলাদের অবস্থা, তাদের গোপনাঙ্গ, কোমল বাক্যালাপ, মৃদু পদচালনা এবং মেয়েলী আচার-আচরণ কিছুই বুঝতে পারে না। একটি শিশু খুব ছোট হওয়ার দরুণ যেহেতু কিছুই অনুভব করতে পারে না তাই মহিলাদের নিকট প্রবেশ করতে তার কোন বাধা নেই। পক্ষান্তরে সে যখন সাবালক বা এর নিকটবর্তী বয়সে উপণীত হবে, মহিলাদের মেয়ে-সূলভআচার-আচরণ বুঝতে ও অনুভব করতে এবং সুন্দরী ও অসুন্দরির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে শিখবে তখন কোন অবস্থাতেই মহিলাদের নিকট তার প্রবেশাধিকার গ্রহণযোগ্য নয়।

ইমাম বগভী রহ. মুজাহিদ রহ. এর উদ্ধৃতি দিয়ে এ আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করেন- 'ছোট হওয়ার দরুণ অন্যের গোপনীয় অঙ্গ সম্পর্কে তারা ওয়াকিবহাল নয়।'

আবু বকর আল-জাস্সাস রহ. বলেন, 'মুজাহিদ রহ. এর বক্তব্য একেবারে সুস্পষ্ট। যেহেতু আয়াতের অর্থই হচ্ছে- তারা অতিশয় ছোট্ট হওয়া ও জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে মেয়েলী আচরণ ও নারী-পুরুষের গোপনাঙ্গের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে না। তবে যে সব শিশু মেয়েদের গোপনাঙ্গ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল তাদেরকে মহিলাদের নিকট প্রবেশের ক্ষেত্রে তিন সময় অনুমতি গ্রহণ আল্লাহ তাআলা বিধি-বদ্ধ করে দিয়েছেন।

ইরশাদ হচ্ছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُم

-58)النور(

'হে মুমিনগণ, তোমাদের দাস দাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি তারা যেন তিন সময়ে তোমাদের কাছে অনুমতি গ্রহণ করে। ফজরের নামাজের পুর্বে, দুপুরে যখন তোমরা পোশাক খুলে রাখ এবং এশার নামাজের পর।"

অন্য স্থানে আল্লাহ পাক প্রাপ্তবয়স্কদের অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন-

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم.ْ
-59)النور(

'তোমাদের সন্তান-সন্ততিরা যখন বয়োঃপ্রাপ্ত হয়, তারা যেন তাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় অনুমতি চায়।"

উপরোক্ত বয়োঃস্তরের বিন্যাস বাস্তবসম্মত ও সুপ্রমাণিত। অবিকল এই প্রকরণের কথাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

প্রতিপালনের সার্বজনীন উদ্দেশ্য:

গোত্র ও জাতিসমূহ থেকে কতিপয় মানব ইউনিট নিয়ে গঠিত হয় একটি সমাজ। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন -

وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا (الحجرات(13 -

'এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হও!'**১১**

এই একতা বিনির্মাণের ক্ষুদ্রতম ও সর্বপ্রথম শৃংখলাবদ্ধ ইউনিট হলো 'পরিবার'। যা মা-বাবা, ছেলে-মেয়ে তথা সন্তান-সন্ততি নিয়ে গঠিত। এটা এমন ব্যক্তিগোষ্টির সমষ্টি

যাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় ও অটুট বন্ধনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই ব্যক্তিসমূহের তথা একটি পরিবারের উৎকৃষ্ট ও উত্তম পরিচর্যার মাধ্যমে সমাজের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। সমাজের সভ্যতা-সংস্কৃতি অনুধাবন করতে সক্ষম ব্যক্তিকে সমাজের একটি যোগ্য অঙ্গ হিসেবে প্রস্তুত করতে হবে। এখান থেকে আমরা এ সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, সভ্যতা-সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়ে যে হবে সমাজের জন্য আদর্শ।
বাস্তব কর্ম, চিন্তা ও গবেষণায় ভারসাম্য আনয়নের মাধ্যমে সমাজ উন্নয়নে থাকবে সদা নিবেদিতপ্রাণ। এটাই হলো সার্বজনীন তরবিয়তের এর মূল লক্ষ্য।
ইসলামী সমাজের জন্য সার্বজনীন তরবিয়ত এর লক্ষ্য হল ব্যক্তিকে প্রস্তুত করতে হবে ইসলামী সুউচ্চ ইমারতের একটি ইট হিসেবে- যিনি ইসলামের হাকিকত সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও তার বাস্তব অনুশীলন, সমাজ উন্নয়ন ও অগ্রগতি এবং বিশ্ববাসীর কাছে আল্লাহর দীন পৌঁছানোর ব্রতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবেন। যাতে আল্লাহ প্রদত্ত সকল যোগ্যতা ও সর্বশক্তি ব্যয় করে তাকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সে বাস্তবায়িত করতে পারে।

বিশুদ্ধ প্রতিপালনের দাবী:

তরবিয়ত একটি চারিত্রিক কর্মতৎপরতা, শিষ্টাচারগত বাধ্যকতা ও দায়িত্ব। যা আদায় করবেন শিশুর পিতা বা অভিভাবক। অথবা তাদের নিযুক্ত কোন প্রতিনিধি। প্রয়োজন হলে সকলে মিলে পালন করতে পারেন শিশু পরিচর্যার এ মহান দায়িত্ব।

বয়োঃপ্রাপ্তি পর্যন্ত সন্তানের লালন-পালন, তাদের যত্ন ও পরিচর্যা, শিষ্টাচার শিক্ষাদানের দায়িত্ব স্বাভবিকভাবে মা-বাবা ও অভিভাবকদের ওপর বর্তায়। এ মর্মে শরিয়তের সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا (التحريم(6)

'তোমরা নিজেদের এবং আপন পরিবার-পরিজনকে আগুন থেকে রক্ষা কর!.......।১২

সাহাবী কাতাদাহ রা. বলেন, 'অভিভাবক তাদের রক্ষা করবে, তাদেরকে আল্লাহর আনুগত্যের নির্দেশ করবে, তার নাফরমানী থেকে নিবৃত করবে এবং আল্লাহর নির্দেশ

পালনের ক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব নিবে, আল্লাহর আদেশ পালনের নির্দেশ প্রদান ও তাতে সহযোগিতা করবে। যখনই আল্লাহর কোন নাফরমানী গোচরে আসবে তাদেরকে তা হতে ফিরিয়ে রাখবে।
ইবনে কাসির রহ. বলেন, 'তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ কর, অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখ আর তাদেরকে অযথা কাজে ছেড়ে দিও না। তাহলে কিয়ামত দিবসে অগ্নি তাদেরকে গ্রাস করে ফেলবে। '

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

'তোমরা প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল অভিভাবক এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহী করতে হবে। '

এ হাদীসের দাবী মতে- 'একজন ব্যক্তি হবে তার পরিবারে দায়িত্বশীল কর্তা ও তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এমনিভাবে একজন মহিলা তার স্বামীর গৃহে দায়িত্বশীলা গৃহিণী এবং তাকেও নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। অতএব প্রত্যেকেই এক একজন দায়িত্বশীল এবং তোমাদের সকলকেই নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-

علمو الصبي الصلاة ابن سبع سنين واضربوا عليها ابن عشر

'সন্তানের বয়স সাত বছর হলে নামাজ শিক্ষা দাও! ও বয়স দশ বছর হলে নামাজের জন্য তাকে প্রহার কর।'

শিশুর যত্ন ও প্রতিপালনের দিকনির্দেশনা ও উপদেশ :

তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের ব্যাখ্যা

শিশুর নিকট ছোট বেলা থেকেই তাওহীদের বৃহত্তর অর্থ নিশ্চিত করতে সচেষ্ট থাকা অভিভাবকের কর্তব্য। শিশুর বয়োঃপ্রাপ্তি বা বড় হওয়ার সময়ের জন্য এ বিষয়গুলো রেখে দেবে না। বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় তার কর্ণকুহরে এ কথার পুনরাবৃত্তি করতে হবে 'আল্লাহ তাআ'লা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আবার আমাদের জন্য আহার্যের যোগান দিয়েছেন, তার কোন অংশীদার নেই। নিশ্চয়ই তিনি মহামহিমান্বিত, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, তবে সৃষ্টিকুল সকলেই তার মুখাপেক্ষী। আল্লাহ তাআ'লা প্রজ্ঞাময় ন্যায়পরায়ণ, তিনি মানুষের প্রতি বিন্দুমাত্র অবিচার করেন না। ইত্যাদি বিষয়গুলো শিশুর অন্তরে গেঁথে দিতে হবে। আল্লাহ তাআ'লা'র নান্দনিক ও বিমূর্ত গুণাবলি যেমন মহত্ব, বড়ত্ব, ক্ষমতা, শক্তি, শ্রবণ ও দৃষ্টি ইত্যাদিকে আমরা তার জন্য নিশ্চিত করি। এক্ষেত্রে তার কর্ণকুহরে কালামুল্লাহর পুনরাবৃত্তির চেয়ে অতিরিক্ত অন্য কিছুর দরকার নেই। যেখানে সান্নিবেশিত রয়েছে তার নান্দনিক গুণাবলি ও তাওহীদের ব্যাপক অর্থ। এ বিষয়ে কোন বিশ্লেষণে যাবো না, যেহেতু এগুলো হলো এমন বিষয় যার ওপর সাধারণ মানুষের স্বভাবজাত সত্তা গড়ে উঠেছে। সুতরাং এটা শুধু স্মরণ করিয়ে দেয়া। এর বেশি কিছুর প্রয়োজন নেই। ব্যাখ্যা অনেক পরের বিষয়। সময়ের পূর্বে ব্যাখ্যা শ্রোতাকে কখনো কখনো ভুলত্রুটির মধ্যে নিমজ্জিত করে ফেলে থাকে।

সাহসিকতায় অভ্যস্ত করা

সাহসিকতা একটি বড় গুণ। সাহসিকতার বদৌলতে অনেক দুঃসাধ্য সাধন করা সম্ভব। সে কারণে শিশুদেরকে এই বিষয় প্রশিক্ষণ প্রদান ও তাদেরকে এর প্রতি অভ্যস্ত করা উচিত। পিতা কর্তৃক তার সন্ত ানদের মধ্যে খেলাচ্ছলে পরস্পর কুস্তি লড়াইয়ের আয়োজন করতে পারেন তাদেরকে সাহসিকতায় অভ্যস্ত করার জন্য। এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যে, বিষয়টা এর মধ্য দিয়ে যেন কাংক্ষিত লক্ষ্যের বাহিরে চলে না যায়।

মুহম্মদ বিন আলী বিন হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'হাসান রা. ও হুসাইন রা. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্মুখে কুস্তি ধরে ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতে লাগলেন, 'এটা হাসান (ভাল)।' তখন ফাতেমা রা. তাঁকে বললেন- 'হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কি হাসানের পক্ষ নিচ্ছেন? সে যেন আপনার নিকট হুসাইনের চেয়ে বেশি প্রিয়। উত্তরে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'জিব্রীল হুসাইনের রা. পক্ষ নিয়েছেন সুতরাং আমি হাসানের পক্ষ নেয়াকে পছন্দ করেছি।

অভিভাবকের প্রতি শিশুর ভালোবাসাকে তার সকল কর্মকাণ্ড সম্পর্কে খবরদারী করা ও তার আচরণকে নিয়ন্ত্রণের ধারক হিসেবে গণ্য করা ঠিক হবে না। তাকে এমন বিষয় ভীতি প্রদর্শন করা যা তাকে হত্যা করে ফেলবে অথবা এই চরিত্রটি তার মধ্যে আসার পর খুব তাড়াতাড়ি মানসিকভাবে তাকে দুর্বল করে ফেলবে। অতঃপর কোন উদ্ভূত পরিস্থিতির মুখোমুখী হলে সে আর শক্তি সঞ্চয় করতে পারবে না। অথবা কোন বিশুদ্ধ বস্তু দিয়ে তাকে ভীতি প্রদর্শন করা, যাতে প্রকৃতপক্ষে কোন ভীতি বা আশঙ্কার উদ্রেক না হয়। তাহলে এর বিপরীতে তার নিকট নেতিবাচক অভিজ্ঞতা সৃষ্টি হবে।

অতএব কখনোই শিক্ষক, চিকিৎসক ও পুলিশের লোক ইত্যাদির মাধ্যমে শিশুকে ভীতি প্রদর্শন করা উচিত নয়। কারণ এটা তাকে উল্লেখিত ব্যক্তিবর্গকে অপছন্দ ও তাদের কর্মসমূহকে ঘৃণা করতে উদ্যত করবে। যেমনিভাবে তাকে উদাহরণ স্বরূপ; বিপদ-মৃত্যু, ভূত-প্রেত অথবা চোর-ডাকাতের ভয় দেখানো উচিত নয় যা তার মধ্যে বিরূপ প্রভাব ফেলে থাকবে। ফলে সে অপরিচিত স্থান অনুসন্ধান করার সাহস হারাবে, অথবা অন্ধকারের ভয় দেখানো হলে অন্ধকার স্থান অতিক্রম করার শক্তি পাবে না ইত্যাদি। আমার এ কথার অর্থ এই নয় যে, বাস্তবিকই যেখানে বিপদাশঙ্কা রয়েছে সেক্ষেত্রেও শিশুকে সতর্ক করা যাবে না অথবা বিপদের সকল উপকরণ উপস্থিত হওয়ার পরও তা হতে তাকে বিরত রাখা যাবে না। কেবলমাত্র ভীতি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন যা তাকে মিথ্যা বলতে প্ররোচিত করবে অথবা কোন বিষয় সম্পর্কে ভীতিপ্রদর্শনের ক্ষেত্রে স্পষ্ট মিথ্যা বলা- বাস্তবে যার কোন অস্তিত্ব নেই- নিষিদ্ধ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'যখন রাতের আঁধার নামে অথবা রজনী ডানা মেলে দেয়, তোমাদের বাচ্চাদেরকে তোমরা প্রত্যাহার করে নাও! কারণ শয়তানের দল তখন ছড়িয়ে পড়ে। এরপর যখন রাতের একটা অংশ অতিবাহিত হয় তখন তাদেরকে ছেড়ে দাও!'৪৮ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বানী- 'যখন রাতের অন্ধকার নামে বা রাত ডানা মেলে দেয়।' অর্থাৎ সূর্যাস্তের পর রাতের আগমন। তাঁর বাণী-'তোমাদের বাচ্চাদের প্রত্যহার করে নাও!' অর্থাৎ এ সময়টায় তাদের বের হতে বারণ কর।

কৌতুক, রসিকতা ও বিনোদন:

ভালোবাসা ও মমতায় ভরা পারিবারিক পরিবেশের উপলব্ধি শিশুর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শুধু কথায় নয়, বাস্তব কাজ-কর্মে, আচার-আচরণে এর প্রমাণ থাকতে হবে। কাজেই শিশুর সঙ্গে রসিকতা ও কৌতুক এবং তার নিকট বিনোদনমুখর পরিবেশ তৈরী করা অভিভাবকের কাছে একান্তভাবে কাম্য। তার অবস্থাবলি ও খেলাধুলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদও এর অন্তর্ভুক্ত। আপনি যেন একজন বড় মানুষের সঙ্গে আলোচনা করছেন, তাকে এভাবে সম্মোধন করা। যেমন- আপনি যেন তাকে বলছেন, 'হে অমুকের বাপ, তুমি কেমন আছো?' অথবা হে অমুকের মা, ইত্যাদি।

আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মধ্যে প্রবেশ করে কৌতুকচ্ছলে আমার ছোট ভাইকে বললেন, 'হে আবু ওমায়ের, (নুগায়ের) কি করে ? আবু ওমায়ের রা. তখন সবেমাত্র দুগ্ধপান ছেড়ে দিয়েছেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সঙ্গে রসিকতা করলেন ও তাকে হাসালেন। যেমন অপর বর্ণনায় এসছে 'এবং তাকে নুগায়ের সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন। ইবনে হাজার রহ. বলেন, 'এখানে কৌতুক ও রসিকতার পুনরাবৃত্তির অনুমতি দেয়া হয়েছে। এ বৈধতা কোন ছাড় নয় বরং এটা সুন্নত। যে শিশু ভালোমন্দ নির্ণয় করতে পারে না তার সঙ্গেও রসিকতা বৈধ।

শিশুর প্রয়োজনে সাড়া দেয়া:

শিশুর রকমফের প্রত্যাশা থাকে যা সে অর্জন করতে চায়। সেখান থেকে কয়েকটা বিষয় এমনও রয়েছে যা গ্রহণযোগ্য প্রয়োজন হিসেবে বিবেচিত। যেমন তার খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র, তাকে গুরুত্ব প্রদান ও মূল্যায়নের অনুভূতি, তার প্রতি অনুগ্রহ ও পারিবারিক ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশ ইত্যাদির সংস্থান। শিশুর এ সকল প্রয়োজনে সাড়া দেয়া ও তা পূরণে সচেষ্ট হওয়া উচিত। অনেক বিষয় এমন আছে যা গ্রহণযোগ্য নয়, যেমন: পূর্বে উল্লেখিত বিষয়ে অতিরঞ্জন যা ভারসাম্যের সীমা অতিক্রম করে যায়। আর কিছু বিষয় আছে যা শুধু উত্তমের পরিপন্থী অথবা অশোভন এর পর্যায় পড়ে। অতএব অভিভাবককে সকল প্রয়োজনের সঙ্গে একই ধরনের আচরণ করা অথবা সেটা গ্রহণ ও বর্জনের ক্ষেত্রে একই পথে চলা উচিত হবে না। বরং প্রত্যেকটাকে তার উপযুক্ত স্থানে রাখতে হবে।

একাধিক সন্তান থাকলে তাদের মধ্যে সমতা বিধান করা:

লিঙ্গের কারণে শিশুদের মধ্যে পার্থক্য না করা প্রতিপালনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আচার-ব্যবহার অথবা দানের ক্ষেত্রে ছেলেকে মেয়ের ওপর প্রাধান্য দেয়া হয়, এটা ঠিক নয়। অথবা মেয়ের তুলনায় ছেলের যত্ন ও বিকাশের দিকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। কারণ এসবই অবিচার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন এক ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বলেছিলেন যে তার এক সন্তানকে বিশেষভাবে সম্পদ দান করেছিল, 'তোমার প্রত্যেকটি সন্তানকে কি তার মত দান করেছো?' সে বলল, না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তাহলে এটা ফিরিয়ে নিয়ে যাও!' অন্য বর্ণনায় এসছে- 'এ ছাড়া তোমার কি আর কোন সন্তান আছে?' সে বলল, হ্যাঁ অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন- 'তাদের প্রত্যেককে কি তুমি এর মত দান করেছো?' সে বলল- না। তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে আমাকে সাক্ষী বানিও না।

কারণ আমি অন্যায়ের সাক্ষ্য দেই না। 'সন্তান-সন্ততির মধ্যে সমতা বিধানের ক্ষেত্রে স্পষ্ট নির্দেশ এসেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন,

'তোমরা তোমাদের সন্তানদের মধ্যে সমতা বিধান কর! তোমরা তোমাদের সন্তানদের প্রতি ন্যায়বিচার কর! '

একই লিঙ্গের সকল ব্যক্তির মধ্যে সমতা বিধানের ক্ষেত্রে সতর্ক হওয়া উচিত, যেমনিভাবে এক সন্তানকে অপর সন্তানের চেয়ে অতি বেশি গুরুত্ব না দেয়া উচিত। অথবা অতিরিক্ত ভালবাসা প্রকাশ করা উচিত নয়। যেমন সায়্যেদুনা হযরত ইউসুফ আ. এর ঘটনা। তাঁকে অন্য সন্তানদের তুলনায় তার পিতা অপেক্ষাকৃত বেশি ভালোবাসার কারণে অন্য ভাইয়েরা তার সঙ্গে কিরূপ আচরণ করেছিলেন। আল্লাহ তাআ'লা ইরশাদ করেন-

إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا ..... يوسف(8 -

'ইউসুফ ও তার ভাই আমাদের পিতার নিকট আমাদের চেয়ে বেশি প্রিয়.......। '

অতঃপর তাদের বাবাকেই তারা একথা বলে অপবাদ দিলো-

إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. (يوسف(8-

'নিশ্চয়ই আমাদের পিতা সুস্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে অবস্থান করছেন। '
এরপর তারা সমস্যার সমাধান চেয়েছেন একথা বলে-

اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. (يوسف- 9)

'তোমরা ইউসুফকে হত্যা কর অথবা তাকে কোন স্থানে ফেলে আস, ফলে তোমাদের পিতার দৃষ্টি শুধু তোমাদের প্রতিই নিবিষ্ট হবে এবং তার পর তোমরা ভালো লোক হয়ে যাবে।'৬৬ সুতরাং সকলকে রেখে বিশেষ কোন সন্তানের প্রতি ভালোবাসা ও গুরুত্বারোপ হিংসা ও বিদ্বেষের জন্ম দেয় যা তাদের কাউকে সেই প্রাধান্যপ্রাপ্ত সন্তানের বিরুদ্ধে চক্রান্তকরতে পর্যন্তউদ্যত করে থাকে। যাতে হিংসার যন্ত্রনা থেকে তারা

পরিত্রাণ পেতে পারে। তবে কখনো কখনো এই প্রাধান্যদানের ক্ষেত্রে বাবার পক্ষ থেকে সত্যিকারার্থে অসংখ্য বৈধ কারণও থাকতে পারে। কিন্তু সন্তানরা সাধারণত তা ঝুঝতে পারে না। কাংক্ষিত সমতাবিধান পার্থিব বিষয়াদিতে অসম্ভব নয়, কিন্তু বিষয়টা হলো অপার্থিব বিষয়গুলোর মধ্যে তা সীমা অতিক্রম করে যায়। যেমন চেহারার প্রফুল্লতা, স্নেহেরদৃষ্টি ও স্মিতহাসি এমনকি তার আদিষ্ট কর্মসমূহ ও শিশুদের পার্থিব অপার্থিব সকল চাহিদার সুষম বণ্টন। অভিভাবক কর্তৃক শিশুদের মধ্যে সমতা বিধান তাদেরকে পরস্পরে এই নান্দনিক চরিত্র মাধুর্য বিতরণে উদ্বুদ্ধ করবে।

শিশুদের মাঝে সৃষ্ট সমস্যার সমাধান:

এমন কোন স্থান বা ঘর নেই যেখানে শিশুদের মধ্যে সমস্যা সৃষ্টি হয় না। কখনো দুই বা ততোধিক ভাই একে অপরের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি হতে পারে, যেমনিভাবে ভাই ও বোনের সঙ্গে বিরোধ হয়ে থাকে ইত্যাদি। অনেক অভিভাবক আছেন এক্ষেত্রে প্রথম বারেই আদেশ ও নিষেধাজ্ঞা, কঠোরতা ও অবয়ব বিকৃত করে চিৎকার করার দ্বারা ত্বরিত হস্তক্ষেপ করতে তৎপর হয়ে থাকেন। কারণ দ্রুত সন্দেহ নিরসনের বাসনা তার মধ্যে তখন জেঁকে বসে। এখন তার একটাই চিন্তা হয়ে গেছে, তাহলো সকল আওয়াজ নিস্তব্ধ করে দেয়া। যদিও এর একটা ভাল দিকও আছে, কিন্তু তারপরও সমস্যার পূর্ণ সমাধানে তা সহায়ক নয়। বরং অভিভাবক তাদের পর্যবেক্ষণ থেকে অনুপস্থিত থাকে তখন যে কোন সময় পুনরায় সেই লেজকাটা সমস্যাটি মাথাচারা দিয়ে উঠার আশঙ্কা রয়েই যায়। সুতরাং মূল সমস্যা ও তা মূলোৎপাটনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত না হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে সমস্যা সমাধানে অভিভাবকের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। তবে তিনি যদি সামান্য সুযোগ দিতে পারেন ও যখন অপেক্ষা করলে কোন বিপদাশঙ্কাও না থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে কোন হস্তক্ষেপ না করে বরং দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকবেন। ফলে তিনি দেখতে পারবেন, কিভাবে শিশুরা নিজেদের সমস্যার সমাধান করে থাকে ও এ পর্যায়ে তাদের সামর্থ সম্পর্কে অবগত হতে পারবেন। ফলে অভিভাবকের জন্য এ জাতীয় সতর্ক পদক্ষেপ হবে যেন একটি খোলা জানালা; যেখান থেকে তিনি শিশুর চরিত্র, আচরণ ও সামর্থসমূহ দেখতে পারবেন। কিন্তু বিষয়টি যখন হস্তক্ষেপের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে, সেখানে অপেক্ষা করার কোন সুযোগ নেই, তখন তাৎক্ষণিকভাবে হস্তক্ষেপ করা কর্তব্য।

কিন্তু কখনো ঘটনা এমনও ঘটে যেতে পারে যে, একপক্ষ এসে আপনার নিকট অপর পক্ষের বিরুদ্ধে আপনার সাহায্য ও সমর্থন চাইবে। তখন যদি সে অত্যাচারিত না হয়ে থাকে তাহলে তাকে সহায়তা প্রদান আপনার উচিত হবে না। এতটুকু বিবেচনা ব্যতিরেকে তাকে সাহায্য করলে অন্যরা মনে করবে আপনি একজন অত্যাচারী। আপনি সন্তানদের মধ্যে একজনের তুলনায় অন্যজনকে বেশি ভালোবাসেন।
পরিস্থিতি যদি এমন হয় যে, আপনি একজনকে সাহায্য করলেন, আর অপরজন মনে করল আপনি তার প্রতি অবিচার করেছেন। তাহলে সে স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়ে আপনাকে বলবে, 'আপনি আমার প্রতি অবিচার করেছেন।' এহেন পরিস্থিতিতে শুধু ঐ কথাটার জন্য এই ভিত্তিতে শাস্তি দেয়া যাবে না যে, সে বেয়াদবী করেছে। বরং এক্ষেত্রে হৃদয়ের উ'তা দিয়ে কথাটা গ্রহণ করা অভিভাবকের কর্তব্য ও তাকে স্পষ্ট করে দিতে হবে যে, আপনি তার প্রতি কোন অবিচার করেননি। আর এটাই হলো মার্জিত সমাধান। এ প্রসঙ্গে আপনার নিকট বিদ্যমান প্রমাণগুলো পেশ করতে পারেন। শিশুকে প্রহার করা বা শাস্তি দেয়া অভিভাবকের কর্মের ওপর তার সিদ্ধান্ত টলাতে পারবে না। পক্ষান্তরে তথ্য প্রমাণসহ বিবরণ সত্যটাকে ফুটিয়ে তুলতে ও অভিভাবকের পদক্ষেপে তাকে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হবে। উপরন্তু তার অন্তরে 'অত্যাচারিতকে সাহায্য করা উচিত' এ বিশ্বাস বদ্ধমূল করে দিতে পারে।

সুন্দরতম শব্দাবলীর ব্যবহার:

শিশুরাতো অবাঞ্চিত কর্মকাণ্ড করতেই পারে। তাদের এই প্রবণতা কখনো বা অভিভাবকদের বিশ্রী শব্দাবলী প্রয়োগে শিশুদের গালি দিতে উদ্যত করে থাকে। যেমন অভিসম্পাত করা অথবা কোন ইতর প্রাণীর নামে তাকে অভিষিক্ত করা ইত্যাদি। মনে রাখতে হবে এ আচরণটি নিঃসন্দেহে শিশুর মনের মধ্যে অবিলম্বে স্থান করে নেবে। এর ফলে সে তার ভাই-বোন ও সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে অনুরূপ আচরণ করতে প্রয়াস পাবে।

'এটা বলো না! এটা বলো না!' একথা শতবার বলার চেয়ে আমাদের জন্য উত্তম ও কর্তব্য হলো এই শব্দগুলো যা থেকে আমরা শিশুদেরকে নিষেধ করি, সেগুলোকে

আমাদের ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ না করা। অভিভাবক শিশুর ওপর ক্রোধান্বিত হলে তাকে গালি বা অভিশাপ দেয়ার স্থলে বলতে পারেন-আল্লাহ তাআ'লা তোমাকে সংশোধন করুন অথবা আল্লাহ তাআ'লা তোমার প্রতি দয়া করুন ইত্যাদি।

শিশুর চরিত্র সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন:

শিশুর মধ্যে কখনো অমার্জিত চরিত্র ও অবাঞ্চিত আচরণ লক্ষ্য করা যায়। তা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অভিভাবককে কালবিলম্ব না করে তা হতে শিশুকে উদ্ধারের প্রচেষ্টা চালাতে হবে। কারণ যত দিন যাবে শিশুর মনের মধ্যে তা বদ্ধমূল ও স্থায়ী আসন গাড়তে থাকবে। এরপর তার মূলোৎপাটন অথবা পরিবর্তন একেবারে কষ্টসাধ্য হয়ে পড়বে। ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন, 'শিশুর জন্য তার চরিত্রের বিষয়ে গুরুত্বারোপ সর্বাপেক্ষা জরুরি। শৈশবে তার অভিভাবক যে চরিত্রের ওপর শিশুকে অভ্যস্ত করেছে সেই আদলেই তো সে গড়ে উঠবে। যেমন: অনুরাগ ও ক্রোধ, অস্থিরতা ও ত্বরা, প্রবৃত্তির সঙ্গে নমনীয়তা, দ্রুততা ও তীক্ষ্ণতা এবং লোভ ইত্যাদি। অতঃপর পরিণত বয়সে গিয়ে এর সংশোধন দুরুহ ও কষ্টসাধ্য হয়ে পড়বে। ফলে এই মন্দ চরিত্রগুলো তার গুণাবলি ও ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়ে যাবে। সে যদি কোন ভাবে তা হতে সম্পূর্ণ রূপে আত্মরক্ষা করতে না পারে তাহলে সে লাঞ্ছিত হবে অন্তত একদিনের জন্য হলেও। সে কারণেই আপনি সমাজে অনেক বিকৃত চরিত্রের লোক দেখতে পাবেন যারা তাদের শৈশবের প্রতিপালন ও পরিচর্যার ফসল ও যার ওপর তারা বিকশিত হয়েছে।' ঐ নিন্দিত চরিত্রসমূহ থেকে নিষেধাজ্ঞা ও সতর্কতা প্রদানের ক্ষেত্রে অবশ্যই কৌশল অবলম্বন করতে হবে। যেমন সরাসরি নয় ইশারা ইঙ্গিতে, ধমকি নয়, নম্রতা ও অনুগ্রহের মাধ্যমে মন্দ চরিত্র থেকে তাকে বিরত রাখতে হবে। কারণ নিন্দিত চরিত্রে স্পষ্ট ঘোষণা তার মর্যাদা ও ব্যক্তিত্বের পর্দা ছিড়ে ফেলে। ফলশ্রুতিতে অসংখ্য বিরুদ্ধাচারণের প্রতি দুঃসাহসের জন্ম দেয় ও সর্বোপরি তাকে একগুঁয়েমি করতে প্রলুব্ধ করে। এ প্রেক্ষিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আপনার শিশুকে দুঃশ্চরিত্র শিশুদের সংশ্রব থেকে সম্পূর্ণ রূপে রক্ষা করতে হবে, যদি তারা আত্মীয়ও হয়ে থাকে।

বেশভূষা, পরিচ্ছন্নতা ও শিশুর স্বাস্থ্যের প্রতি সযত্নদৃষ্টি রাখা:

শিশুরা এই ছোট বয়সে অন্যদের থেকে রোগব্যধিতে বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে। ওরা তাৎক্ষণিকভাবে সাধারণত নিজেদের স্বাস্থ্যগত বিষয়গুলো ও স্বাস্থ্যের প্রতি ভালোকরে যত্ন নিতে জানে না। সুতরাং অনুসন্ধান করে তাদের স্বাস্থ্যগত ত্রুটিগুলো খুঁজে বের করা অভিভাবকের কর্তব্য। এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিশুটির শীর্ণকায়তার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন ও তাদের ওপর বদ নজরের প্রতিক্রিয়া দূর করার জন্য ঝাড় ফুঁকের পরামর্শ দিলেন। যখন তিনি নিশ্চিতভাবে অবগত হতে পারলেন যে, তাদের এ দূরাবস্থা কুদৃষ্টির কারণেই হয়েছে। এমনিভাবে তাদের বেশভূষা ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি গুরুত্ব দেয়ার কথাও বললেন।

আত্ম সংশোধন শিক্ষার জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া

শরিয়তের পরিভাষায় আত্মা সম্পর্কে বেশ আলোকপাত করা হয়েছে। আল্লাহ তাআ'লা আত্মা সম্পর্কে বলেন,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا . وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (الشمس(10-9-

'নিশ্চয় সে সফলকাম হয়েছে যে নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে। এবং সে ব্যর্থ হয়েছে যে একে কলুষিত করেছে।

তিনি আরো বলেন,

)النازعات(40-41

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى . فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى.

'আর যে স্বীয় রবের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বিরত রাখে নিশ্চয় জান্নাত হবে তার আবাস স্থল। '

এ আয়াতগুলো আত্মার প্রতি যত্ন নেয়ার গুরুত্বকে স্পষ্ট করে দেয়। ফলে আত্মা থেকে দোষত্রুটিকে 'না' বলে দেয়া হয়। কথা ও কাজের মাধ্যমে আত্মাকে নির্মল ও পরিশুদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালায়। অভিভাবকের জন্য শিশুর বয়োঃপ্রাপ্তি পর্যন্ত অপেক্ষা করা ঠিক নয়। এরপর সে শিশুর আত্মাকে পরিশুদ্ধ ও সমূহ ত্রুটিবিচ্যুটি থেকে নিষ্কলুষ করবে। বরং তার সাথে ভালো-মন্দ নির্ণায়ক বয়স আরম্ভের সাথে সাথে এ বিষয় তার সঙ্গে সূচনা করবে। তার সামনে স্পষ্ট করে তুলবে যে, আল্লাহ তাআ'লা তার সকল ব্যাপারে অবগত, তার কোন কিছুই তার কাছে লুকায়িত নেই। কেরামান কাতেবীন ফেরেস্তা তার ভালো-মন্দ সকল কর্ম লিপিবদ্ধ করে রাখছেন। সুতরাং তাকে কল্যাণকর কাজের নির্দেশ করবে এবং অন্যায় ত্যাগ ও নিজের আত্মার পর্যবেক্ষণের দিকে আহ্বান জানাবে।

কোরআনে কারীমের অংশ বিশেষ মুখস্থ করানো

কোরআনে কারীম হলো মহামহিমান্বিত প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তাআ'লার বাণী। যার মধ্যে নিহিত আছে সমগ্র মানব জাতির ইহ-পারলৌকিক সার্বিক কল্যাণ ও সৌভাগ্য। অতীতে ও বর্তমানে কোরআনের মর্যাদা অনুযায়ী মুসলমানগণ আপন নেতৃত্ব গ্রহণ করে নিয়েছে। মুসলিম উম্মাহর কাংক্ষিত মর্যাদা ও হৃত গৌরব আল্লাহর কালাম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহর আনুগত্য ব্যতীত কখনোই উদ্ধার করা সম্ভব নয়। সুতরাং কোরআনে কারীম নিজেরা মুখস্থ করা এবং সন্তানদেরকে তা মুখস্থ করানো আমাদের কর্তব্য। আধুনিক পাঠ্যক্রম প্রমাণ করেছে যে, এ বয়সে শিশুর স্মরণ শক্তি অত্যন্ত প্রখর থাকে। অতএব অভিভাবকদেরকে শিশুদের এই সামর্থ্যকে কোরআনে কারীম হেফজ করা ও অধিকাংশ মুসলিম দেশসমূহে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তাহফিজুল কোরআনের আসরে তাদেরকে অংশ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে উত্তমরূপে কাজে লাগাতে হবে। শিশু যেটা হিফজ করতে চায় তা কয়েকবারের বেশি তাকে পুনরাবৃত্তি করতে হয় না। এমনি করে সে আল্লাহর ইচ্ছাই হাফেজে কোরআন হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদও রয়েছে। 'শৈশবের শিক্ষা যেন পাথরে অংকন করা।'

অতীতে ও বর্তমানে এমন অসংখ্য হাফেজ রয়েছে যারা শৈশবকালেই কোরআন হেফজ করতে সক্ষম হয়েছেন। ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'তাফসীর

সংক্রান্ত বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করো। কারণ আমি কোরআন কারীম হেফজ করেছি যখন আমি ছোট ছিলাম। '

ইমাম বুখারী রহ. তার গ্রন্থে এ বিষয়ে একটি অধ্যায় রেখেছেন। তার শিরোনাম করেছেন: 'শিশুদেরকে কোরআনে কারীম শিক্ষা দান।' কুরআনে কারীম হেফজের দ্বারা শিশুর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এমনকি সে নামাজে জামাতে অগ্রগামী হয় ও অনেক বড় বড় শায়খদেরও ইমামতি করে যদি তার হিফজের পরিপক্কতা তাদের চেয়ে বেশি হয়। যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদেরকে বলেছেন, 'তোমাদের ইমামতি করবে যে তোমাদের মধ্যে বেশি কোরআন সম্পর্কে জানে।

শিশুকে সুযোগ্য করে গড়ে তোলা

সাধারত মুসলিম বিশ্বের একটি শিশু স্কুলে যাতায়াত করা ব্যতীত অন্য কোন কাজ করে না। কিন্তু কিছু হতদরিদ্রের সন্তানের ক্ষেত্রেও যে এর ব্যতিক্রম হয় না এমনটি কিন্তু নয়। যারা এক মুঠো জীবিকার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে থাকে। তারা কোন কর্মই উত্তম রূপে সম্পন্ন করতে পারে না। যদিও তা একেবারে ক্ষুদ্র হয়।

গৃহস্থালীর এমন অনেক প্রয়োজনীয় কাজ রয়েছে যা কন্যা শিশুরাই করতে সক্ষম যদি তাদেরকে এ বিষয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এটা বোধগম্য নয় যে, ব্যক্তিকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে বের হওয়া পর্যন্ত সার্বক্ষণিক পড়াশুনার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে হবে, যতক্ষণে তার বয়স হবে আনুমানিক তেইশ বছর। এরপর সে কোন কর্মই আর উত্তম রূপে সম্পন্ন করতে পারবে না। ফলে সে মা-বাবার ওপর বোঝা হয়ে থাকবে। অতএব শিশুকে সুযোগ্য করে গড়ে তোলার ব্যাপারে অভিভাবককে যারপর নাই তৎপর হওয়া উচিত। অর্থাৎ তাকে যে কোন কর্ম উত্তমরূপে সম্পন্ন করার যোগ্য করে গড়ে তোলা। ফলে এর দ্বারা সে নিজে উপকৃত হতে পারবে এবং সমাজেরও প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে। প্রকাশ থাকে যে, সম্পাদনযোগ্য কর্মসমূহ সম্পন্ন করার জন্য শিশুর শরীর ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী ও কর্মক্ষম হয়ে উঠে।

তবে এই কর্মটি সমাজ, যুগ ও এর চাহিদার বিচিত্রতার দরুণ বিভিন্ন রকম হতে পারে। সালাফে সালেহীনগণ রহ. তাদের সন্তানদেরকে সাঁতার শিক্ষা দিতেন। যেমনিভাবে

আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে তাদেরকে তীর চালনা ও অশ্বারোহণ প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকতেন।

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে সকল কাজের মধ্যে আল্লাহর কোন স্মরণ নেই তাই অনর্থক ও খেলতামাশা। কিন্তু চারটি কাজ খেলা হওয়া সত্ত্বেও এরূপ নয়।

.পুরুষের তার বৈধ স্ত্রীর সঙ্গে খেলাধুলা করা

.ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দেয়া

.বিবাদমান দুই ব্যক্তির মধ্যে মীমাংসা করা

.ও সাঁতার শিক্ষা করা।

সময় ও যুগের ব্যবধানে উপকরণ ও প্রয়োজনেরও ব্যবধান হয়ে থাকে। অতএব এ বিষয়টারও মূল্যায়ন করতে হবে।

শিশুকে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ

একজন প্রকৃত অভিভাবক কোন যুক্তিতেই শিশুর পর্যবেক্ষণকে অবহেলা করতে পারেন না। বরং তিনি শিশুকে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণে রাখবেন। কিন্তু অবহেলার এমন কতগুলো প্রকার রয়েছে যে দিকে মানুষ ভ্রুক্ষেপই করে না বরং তারা এর উল্টো মনে করে। আমার নিকট তার বাস্তব উদাহরণ হলো, সন্তানদেরকে আভ্যন্তরীণ আবাসিক বিদ্যালয়সমূহে ভর্তি করানো। যেখানে সপ্তাহে পাঁচ বা ছয় দিন সন্তানদের থেকে তার মা-বাবা বিচ্ছিন্ন থাকেন। যেখানে সকল শিশু একসঙ্গে শিক্ষকবৃন্দের তত্ত্বাবধানে থাকে। এখানে কথিত উপকারিতা হতে ক্ষতিই অনেক বেশি হয়ে থাকে।

.প্রতিষ্ঠানিক সমাজের চরিত্রসমূহে চরিত্রবান হওয়া

.অপর এমন শিশুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া যাদের সম্মন্ধে মা-বাবা কিছুই জানে না।

.মা-বাবার পর্যবেক্ষণ বিচ্ছিন্ন অথবা দুর্বল হওয়ার দরুণ অনেক সমস্যার সৃষ্টি হওয়া।

কখনো বা বলা হয়ে থাকে শিক্ষকদের অসামান্য পরিশ্রম ও ভূমিকা এক্ষেত্রে শিশুর দিক নির্দেশনা ও পর্যবেক্ষণ করে থাকে। ঠিক কথা, তবে এটা কখনোই মা-বাবার ভূমিকাকে নিষ্প্রয়োজন করতে পারে না।

.শিশু ও পরিবারের মাঝে স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসার বন্ধন দুর্বল হয়ে পড়ে।

.শিশুদেরকে নিজ পরিবেশের সংশ্রব ও মেলামেশা থেকে বঞ্চিত রাখা হয়- যা তাকে পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ অপরিচিত পাত্রে পরিণত করবে।

যদি আমরা মেনেও নেই যে, এ পদ্ধতিতেই জ্ঞান আহরণ উত্তম। তারপরও একথা বলবো শুধুমাত্র জ্ঞান অর্জনই সবকিছু নয়। মা-বাবার চোখের সামনে শিশুর বিকাশ তার চেয়ে অনেক অনেকগুণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। উল্লেখ্য যে, শিক্ষায় অসংখ্য মেধাবীমুখ এ সকল বিদ্যালয়ের বাহির থেকেই আবির্ভূত হয়।

বহিরাগত প্রভাব বিস্তারকারীর আনুগত্য

শিশুর মধ্যে বহিরাগত প্রভাব প্রতিফলিত হয়। যেহেতু শিশু তখন স্কুল ও পথের দিকে যায়। ফলে অপরের সংশ্রব পেতে শেখে। হতে পারে তারা প্রতিপালনের ক্ষেত্রে কোন গুরুত্ব পায়নি। ফলে স্ববিরোধী প্রভাব শিশুর মধ্যে প্রকাশ পেতে পারে। তার আচার-ব্যবহারে অনাহুত পরিবর্তন সাধিত হবে আর উম্মেষ ঘটবে নতুন নতুন চিন্তা ভাবনার। বিশেষ করে বিশাল বিশাল মনগড়া তথ্য তৈরীর ছত্র ছায়ায় আমাদের সমাজের সার্বিক উন্নয়নের জন্য আমাদেরকে যার শরণাপন্ন হতে হবে। যদিও এ ধরনের গবেষণার

জন্যও গৃহ, বিদ্যালয়, মিডিয়া ও সরকারী সংস্থাসমূহের ঘাম ঝড়ানো পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। কারণ আমাদের পক্ষে এর পূর্ণাঙ্গ পর্যায় পর্যন্ত অপেক্ষা করা সম্ভব হয় না। এ মহৎ কর্মে অভিভাবকই মূল দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি। তিনিই তো সম্যক অবগত কু-চিন্তা ও মন্দ দৃষ্টিভঙ্গী অথবা অসৎ পরিকল্পনা সমাজে কেমন ঢেউ খেলে। ফলে সে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারবে শিশুর ওপর এর মাধ্যমে কি অবাঞ্চিত পরিবর্তন প্রতিফলিত হয়ে থাকে। সূক্ষ্ম বিচক্ষণতার সঙ্গে এটা তাকে উপলব্ধি করতে হবে এবং একটু কৌশলে তা তাকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ফলে এর উৎস ও তা কোথা থেকে এসেছে তাও সে জানতে পারবে। এখন শিশুর মনন ও আচরণে বদ্ধমূল হওয়ার পূর্বে উপযুক্ত পদ্ধতিতে তার চিকিৎসা করা অভিভাবকের একান্ত কর্তব্য। এর ব্যত্যয় ঘটলে ভবিষ্যতে তার প্রতিকার করা দুরূহ ও কঠিন হয়ে পড়বে।

দায়িত্ব পালনে শিশুর অংশিদারিত্ব

শিশুকে এই বয়সে কোন দায়িত্ব গ্রহণে অংশীদার করা উচিত। এই দিকে তাকাবে না যে, সে এখনো ছোট; বিশেষতঃ এই স্তরের শেষের দিকের সময়গুলোতে। পক্ষান্তরে যদি তাকে কোন দায়িত্বভার গ্রহণে অংশীদার না করা হয় অথচ সে এক পৈরুষের সমপর্যায় পৌঁছার প্রায় নিকটবর্তী হয়ে গেছে। তাহলে আর কবে সে এ দায়িত্বভার গ্রহণ করতে পারবে?

অতএব শিশুকে এ ব্যাপারে সচেতন করা অভিভাবকের কর্তব্য। যেমন:

.তাকে এক দিনের স্থলে একসঙ্গে এক সপ্তাহের খরচার টাকা দিয়ে দিবে। সেখান থেকে প্রয়োজন সাপেক্ষে সে ব্যয় করবে। এবং খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকবে।

.কোন কোন কাজে তার মতামত চাইবে ও তা মনোযোগ দিয়ে শুনবে। তার মতের ব্যাখ্যা করবে। তার সকল কথা কাটবে না। একাধিক বিকল্পের মধ্যে যে কোন একটা নির্বাচনের সুযোগ দেবে।

.এবং তার কাছ থেকে কোন কর্ম সম্পাদনের প্রতিশ্রুতি নেবে। গৃহস্থালী ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কোন কাজের দায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত করবে।

সুন্দর আচরণ

সন্তানের তৃতীয় হক বা অধিকার হলো তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করা। তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা, তাদের সাথে স্নেহের পরশে মেলামেশা করা, তাদের আরাম-আয়েশের প্রতি দৃষ্টি রাখা, তাদের আবেগ-অনুভূতির প্রতি খেয়াল রাখা, তাদেরকে খুশী রাখার চেষ্টা করা এবং এমন আচরণ না করা যাতে তাদের আবেগ আঘাত প্রাপ্ত হয়, তাদের মন ভেঙ্গে না যায়, তারা নিরাশ না হয়ে পড়ে অথবা তাদের অহমবোধ ও আত্মসম্মানে আঘাত না লাগে।

আপনার অধীনের আপনার প্রিয় শিশু সন্তান আপনার দিকে স্নেহ প্রাপ্তির দৃষ্টিতে দেখে থাকে। এটা আপনার জন্য আল্লাহর পুরস্কার। এ পুরস্কারের জন্য আল্লাহর শোকর আদায় করুন এবং তার পুরস্কারের অমর্যাদা করবেন না। সন্তানদের মর্যাদা দিন এবং তাদের সাথে সে আচরণ করুন যার তারা যোগ্য।

সন্তান আল্লাহর আমানত। এ আমানত রক্ষা বা হিফাজত করুন এবং নিজের নাদানী ও খারাপ ব্যবহারের মাধ্যমে এ আমানতকেই নষ্ট করবেন না। সন্তানদের সাথে এমন আচরণ করুন যাতে তারা যোগ্য হয়ে দুনিয়ার জন্য আশীর্বাদ প্রমাণিত হয় এবং আপনার মান-মর্যাদা, সুনাম ও পরকালের মুক্তির পাথেয় হয়।

অসদাচরণের ভয়ংকর পরিণাম

সন্তানের সাথে আপনার আচরণ যদি ভালো না হয়, তাহলে এটা নিজের সাথে, সন্তানের সাথে এবং সমাজের সাথে বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।
কথায় কথায় রাগ করা, চেঁচানো, ভয় দেখানো, গালমন্দ করা, অকাল কুষ্মাণ্ড ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করা, তাদের নির্বুদ্ধিতায় অস্থির হয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা, গালি দেয়া,

তাদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করা, তাদেরকে অহেতুক খেলাধুলা ও হাসা-হাসির সুযোগ না দেয়াই হলো সন্তানের সাথে অসদাচরণ। এ অসদাচরণের পরিণতি খুবই খারাপ এবং খুবই ভয়াবহ হয়ে থাকে। এ ভয়াবহ পরিণতি সন্তান, মাতা-পিতা ও সমাজের জন্য খুবই ক্ষতিকর হয়।

প্রথম বয়সে সন্তান যখন বুদ্ধিহীন, দুর্বল এবং অসহায় থাকে তখন সে আপনার মুহাব্বাত ও মেহেরবানীর অধিকারী থাকে। তখন সে আপনার স্নেহ, হামদরদী, সাহায্য ও পথপ্রদর্শন চায়। কিন্তু আপনার অধীন থেকে সে যদি এ তিনটি নেয়ামত না পেয়ে শুধুমাত্র ক্রোধ ও কাঠিন্যই পায় তাহলে সে প্রকৃতিগতভাবেই আপনার প্রতি নিরাশ হবে। আপনার নিকট থেকে দূরে থাকার ও গৃহ থেকে পলায়নের চেষ্টা করবে এবং যেখানেই সে এ তিন নেয়ামতের বিচ্ছুরণ দেখতে পাবে সেখানেই সে অবলীলাক্রমে অগ্রসর হবে। শিশুরা আসল ও মেকি ভালোবাসার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে না। সমাজের খারাপ প্রকৃতির মানুষ এ ধরনের শিশুদেরকে পথভ্রষ্ট করতে এবং চক্রান্তের জালে আবদ্ধ করার সুযোগ পায়। আর এসব নাদান সন্তান ধীরে ধীরে সমাজের জন্য হয়ে উঠে বিভীষিকাময় এবং বড়ো বড়ো অপরাধ সংঘটন করতে থাকে।

সৌভাগ্যক্রমে এসব শিশু খারাপ মানুষের খারাপ শিকার থেকে যদি পরিত্রাণও পায় তাহলেও তারা মাতা-পিতার স্থায়ী মাথাব্যথার কারণ হয়ে থাকে। মাতা-পিতার সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক হয় না। মাতা-পিতার খারাপ ও দুর্ব্যবহারের পরিণামে শিশুদের অন্তরে মাতা-পিতার জন্য সে পবিত্র আবেগই সৃষ্টি হয় না যা সৌভাগ্যবান সন্তানের অন্তরে সৃষ্টি হয়ে থাকে।

মাতা-পিতা সারা জীবন ধরে তাদের নাফরমানী ও অযোগ্যতার জন্য ক্রন্দন করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে বিদ্রোহী বানানোর ব্যাপারে সবচেয়ে গভীর প্রভাব হিসেবে কাজ করে তাদের অসদাচরণ ও দুর্ব্যবহার। আর মাতা-পিতা এজন্য সন্তানদের ঘাড়েই সকল দোষ চাপায়। কিন্তু জে নে রাখা ভালো যে, এ অবস্থায় সন্তানের চেয়ে মাতা-পিতার অপরাধ কোনো অংশেই কম নয়।

ভালো নাম রাখা

নামেও মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে এবং মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়েও নামের ব্যাপক প্রভাব পড়ে। নাদুস-নুদুস সুশ্রী শিশুদেরকে সবাই আদর করতে চায়। কিন্তু যখন তার নাম জিজ্ঞেস করা হয় এবং যে কোনো অর্থহীন এবং বিশ্রী নাম বলে তখন স্বাভাবিকভাবেই মনটা দমে যায়। এ সময় প্রাণে চায় যে, আহা! তার নামও যদি তার সুশ্রীর মতো হতো। প্রকৃত ব্যাপার হলো, সুন্দর নাম অনুভূতি এবং আবেগের উপর বিরাট প্রভাব ফেলে। ফলে কোনো মহিলাকে যদি বিশ্রী এবং খারাপ নামে সম্বোধন করা হয় তাহলে তার ক্রোধমূলক প্রতিক্রিয়াও লক্ষ্য করা যায়। খারাপ নামে সম্বোধন করায় তার খারাপ আবেগই প্রকাশ পায়। পক্ষান্তরে যদি কোনো মহিলাকে সুন্দর নামে ডাকা হয় তাহলে সে মহিলা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ও ভালোবাসার আবেগে জবাবও দিয়ে থাকে। নিজের ভালো নাম শুনে সে নিজেকে মর্যাদাবান বলে মনে করে।

লোকজন সন্তানকে ভালো নামে ডাকুক, এটাই মাতা-পিতার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা হয়ে থাকে। ভালো নামে ডাকার ফলে একদিকে যেমন শিশু খুশী হয়। অন্যদিকে যিনি ডাকেন তার অন্তরেও তার জন্য সুন্দর ধারণা সৃষ্টি হয়। কিন্তু এটাতো তখনই হতে পারে যখন আপনি আপনার সন্তানের ভালো নাম রাখবেন। আপনার উপর আপনার প্রিয় সন্তানের অধিকার হলো আপনি তার সুন্দর ও পবিত্র নাম রাখবেন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের উম্মাতকে ভালো এবং পবিত্র নাম রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। সাহাবী এবং মহিলা সাহাবীরা যখনই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট নিজের সন্তানের নাম রাখার জন্য আবেদন জানাতেন তখনই তিনি অত্যন্ত পবিত্র ও উদ্দেশ্যপূর্ণ নাম প্রস্তাব করতেন। কারোর নিকট তার নাম জিজ্ঞেস করলে সে যদি অর্থহীন এবং অপসন্দনীয় নাম বলতো তাহলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপসন্দ করতেন এবং তাকে নিজের কোনো কাজ করতে দিতেন না। পক্ষান্তরে সুন্দর ও পবিত্র নাম উচ্চারণ করলে তিনি পসন্দ করতেন। তার জন্য দোয়া করতেন এবং নিজের কাজ করতে দিতেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের কোনো প্রয়োজনে বাইরে বেরুলে তিনি 'ওয়া নাজিহ' অথবা 'ইয়া রাশেদ'-এর মতো বাক্য শুনতে ভালোবাসতেন। যখন কাউকে

কোনো স্থানের দায়িত্বশীল বানিয়ে প্রেরণ করতেন তখন তার নাম জিজ্ঞেস করতেন। সে তার নাম বললে, তাঁর পছন্দ হলে খুব খুশী হতেন এবং খুশীর আলামত তাঁর চেহারায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো। যদি তার নাম তিনি অপসন্দ করতেন তাহলে তার প্রভাব চেহারায় ফুটে উঠতো। যখন কোনো বস্তিতে প্রবেশ করতেন তখন সে বস্তির নাম জিজ্ঞেস করতেন। যদি সে বস্তির নাম তাঁর পসন্দ হতো তাহলে তিনি খুবই আনন্দিত হতেন। অধিকাংশ সময় এটাও হতো যে তিনি অপসন্দনীয় নাম পরিবর্তন করে দিতেন। খারাপ নাম তিনি কোনো বস্তুর জন্যই সহ্য করতে পারতেন না।

ভালো নাম রাখার হেদায়াত ও হিকমত

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ تُدْعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ ، وَأَسْمَاءِ آبَاءِ كُمْ فَاحْسِنُوا أَسْمَائِكُمْ - ابو داود عن أبي الدردا

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে নিজের এবং পিতার নামে ডাকা হবে। অতএব ভালো নাম রাখো।"

আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় নাম

عَنْ أَبِي وَهَبْ رَض عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تُسَمُّوا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَصْدَقُهَا حَارِثُ وَهَمَّامُ وَأَقْبَحُها حَرْبُ وَمُرَّة - الادب المفرد وجمع الفوائد ج ٢ ص

٤٠٦بحو اله ابوا داود ونسائي

"হযরত আবু ওয়াহাব নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, নবীদের নামে নাম রাখো এবং আল্লাহর নিকট পসন্দনীয় নাম হলো আবদুল্লাহ এবং আবদুর রহমান। প্রিয় নাম হলো হারেছ এবং হাম্মাম এবং অত্যন্ত অপছন্দনীয় নাম হলো হারব ও মুররাহ।"

সন্তানের প্রতি স্নেহ ও ভালোবাসা

সন্তানের প্রতি স্নেহ ও ভালোবাসা প্রদর্শনও তাদের একটি অধিকার।সন্তানের প্রতি স্নেহ ও ভালোবাসা দেখানো একটি সহজাত ব্যাপার।
আল্লাহ পাক প্রত্যেক মাতা-পিতার অন্তরে এ সহজাত প্রবৃত্তি সৃষ্টি করেছেন। মাতা-পিতার অন্তরে সন্তানের সীমাহীন ভালোবাসার আবেগ সৃষ্টি করে আল্লাহও মাতা-পিতার প্রতি অসামান্য ইহসান করেছেন।

অন্যদিকে এটা সন্তানের প্রতিও ইহসান। সন্তানের প্রতি ইহসান এ কারণে যে, তাছাড়া সন্তানের লালন-পালন সম্ভবই নয়। বরং তা বেশীর ভাগই অসম্ভব ছিল। মানব শিশু অন্য সকল জন্তুর বাচ্চার তুলনায় সবচেয়ে বেশী অসহায়, মজবুর, দুর্বল এবং সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। মাতা-পিতার অন্তরে যদি তার জন্য স্নেহ ও ভালোবাসার সীমাহীন আবেগ না হতো তাহলে তার লালন-পালনই হতো না। মাতা-পিতার নজিরবিহীন স্নেহ-ভালোবাসা এবং অসাধারণ ত্যাগ কুরবানীর বদৌলতেই সে বড়ো হয়ে উঠে এবং যোগ্য হয়।

পক্ষান্তরে মাতা-পিতার প্রতি ইহসান এজন্য যে, আল্লাহ পাক তাদের উপর সন্তান প্রতিপালনের মহান দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। এ অধিকার মাতা-পিতা কখনই আদায় করতে পারতো না, যদি তাদের সন্তানের প্রতি ভালোবাসার বিরাট আবেগ সৃষ্টি না হতো।

সন্তানের প্রতি ভালোবাসা আল্লাহর রহমাত এবং হিকমতের নিদর্শন এবং তিনি রব বা প্রতিপালক হবার প্রকাশ্য দলিল। কোনো বৈষম্য ছাড়া আল্লাহ প্রত্যেক মানুষের অন্তরে এ আবেগ সৃষ্টি করেছেন। শুধু মানুষই নয়, বরং জীব-জন্তুদেরকেও আল্লাহ এ আবেগ দান করেছেন এবং তারা প্রকৃতিগতভাবে নিজের বংশধরদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করে থাকে।

মুসলমান মাতা'র ভালোবাসার পার্থক্য

সন্তানের প্রতি ভালোবাসা একটি সহজাত আবেগ। এজন্য ধর্ম ও আদর্শ নির্বিশেষে প্রত্যেক মাতা-পিতা নিজের সন্তানকে স্নেহ করে থাকে। কোনো মাতা-পিতা যদি ধর্ম এবং স্রস্টায় বিশ্বাসী নাও হয়, তবুও সে সন্তানকে ভালোবাসে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মুসলমান মাতা-পিতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আর এ বৈশিষ্ট্য ইসলাম বঞ্চিত মাতা-পিতা কখনই লাভকরতে পারে না। সন্তানকে ভালোবেসে একজন অমুসলিম মা-ও নিজের সহজাত আবেগ পূরণ করে। আবার একজন মুসলমান মা-ও এ আবেগই পূরণ করে থাকে। কিন্তু মুসলমান মা'র পৃথক বৈশিষ্ট্য হলো যে, সন্তানকে সে এ অনুভূতিতে ভালোবাসে যে, এটা সন্তানের অধিকার, দীনের দাবী এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামদের সুন্নাত। সন্তানের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন শুধুমাত্র প্রকৃতিগত আবেগ পূরণেই নয় বরং আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তুষ্টিকরণ, আখেরাতে প্রতিদান পাওয়া এবং পরকালীন মুক্তির মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা। এ সুতীব্র অনুভূতির কারণে মুসলমান মায়ের অন্তরে বিরাট আবেগ ও অসাধারণ শক্তির সঞ্চালন হয় এ অনুভূতি সম্পন্ন ভালোবাসা শুধুমাত্র প্রকৃতিগত ভালোবাসার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। দীনি অনুভূতিতে আবেগাপ্লুত ভালোবাসা পোষণকারী মা'র ভালোবাসা অন্ধ ভালোবাসা হতে পারে না। সে দীনের হেদায়াত অনুযায়ী সন্তানকে ভালোবেসে থাকে এবং কখনো আবেগবশত সে এমন পদ্ধতি অবলম্বন করে বসে না যা তার এবং সন্তানের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সন্তানের প্রতি রাসূলের ভালোবাসা

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশেষ খাদেম ছিলেন হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি দিন-রাত তাঁর খিদমতে লেগে থাকতেন। তিনি বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের আত্মীয়-স্বজনকে যেভাবে ভালোবাসতেন তেমন আর কাউকে ভালোবাসতে দেখেননি। সিরাতুন্নবী: দ্বিতীয় খণ্ড

০ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্থায়ী নিয়ম ছিলো, যখনই তিনি সফরে যেতেন তখন সর্বশেষ নিজের প্রিয় কন্যা হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার গৃহে

যেতেন এবং সফর থেকে ফিরে সর্বপ্রথম মসজিদে দু রাকাত নামায আদায় করে হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার গৃহে পৌঁছতেন।

একবার কোনো কথায় হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা এবং হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মধ্যে মন কষাকষি হয়ে গেল। এ ঘটনা জানতে পেরে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের গৃহে গেলেন এবং উভয়ের মধ্যে মিলমিশ করিয়ে দিলেন। অতপর তিনি যখন বাইরে এলেন তখন খুব হাসি-খুশি ছিলেন। লোকজন জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি যখন গৃহাভ্যন্তরে গমন করেছিলেন তখন খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। আর যখন বাইরে আসছিলেন তখন খুব খুশী অবস্থায় ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "হাঁ আমি ঐ দু ব্যক্তিকে মিলিয়ে দিয়েছি। তাদেরকে আমি অত্যন্ত ভালোবাসি।"

-সিরাতুন্নবী: দ্বিতীয় খণ্ড

০ একবার হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু দ্বিতীয় বিয়ে করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা জানতে পেরে খুব দুঃখিত হলেন। তৎক্ষণাৎ মসজিদে গিয়ে খুতবা দিলেন। খুতবায় তিনি নিজের নাখোশের কথা উল্লেখ করে বললেন, ফাতেমা আমার প্রিয় কন্যা এবং কলিজার টুকরা। যে তাকে কষ্ট দেবে সে আমাকে কষ্ট দেবে। -বুখারী

হযরত যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহার স্বামী আবুল আছ বদরের যুদ্ধে গ্রেফতার হয়ে এলেন। সিদ্ধান্ত হলো যে, এসব কয়েদীকে ফিদিয়া নিয়ে মুক্ত করে দেয়া হবে। আবুল আছের নিকট ফিদিয়া আদায় করার মতো অর্থ ছিল না। মুক্তির জন্য স্বগৃহে ফিদিয়ার অর্থ প্রেরণের খবর পাঠালেন। পতিভক্তা স্ত্রী নিজের মা হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার প্রদত্ত হার তৎক্ষণাৎ পাঠিয়ে দিলেন। আবুল আছ এ হার ফিদিয়া হিসেবে পেশ করলেন। হার যখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এলো তখন তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। সাহাবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, "তোমরা সম্মত হলে এ হার কি যয়নবকে ফিরিয়ে দেয়া

যায়?" সাহাবীরা বললেন, অবশ্যই ফিরিয়ে দিন। অতপর তিনি সে হার হযরত যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহাকে ফিরিয়ে দিলেন।

একবার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথাও যাচ্ছিলেন। হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু রাস্তার উপর খেলা করছিলেন। তিনি দু বাহু আন্তরিক স্নেহে প্রসারিত করে দিলেন। যাতে হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর নিকট চলে আসেন। হযরত হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু হাসতে হাসতে তাঁর নিকট আসতেন এবং দুষ্টুমী করে আবার সরে যেতেন। অবশেষে তিনি তাকে ধরে ফেললেন এবং এক হাত তার থুতনীর উপর ও অপর হাত মাথার উপর রেখে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। অতপর বললেন, হুসাইন আমার, আর আমি হুসাইনের। -সিরাতুন্নবী : দ্বিতীয় খণ্ড, বুখারী উদ্ধৃতিসহ

o হযরত যয়নব রাদিয়াল্লাহু আনহার একটি প্রিয় শিশু কন্যা ছিল। তার নাম ছিল উমামাহ। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমামাকে খুব ভালোবাসতেন। প্রায় নামাযের সময়ই সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে থাকতো। তিনি নামাযে দাঁড়ালে সে কাঁধের উপর সওয়ার হয়ে যেত। রুকূ'র সময় তিনি তাকে নামিয়ে দিতেন। তিনি পুনরায় খাড়া হলে সে আবার সওয়ার হতো।

o একবার এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে তোহফা হিসেবে কিছু জিনিস পাঠালেন। তার মধ্যে সোনার হারও ছিল। সে সময় সে সেখানে খেলছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয় সাল্লাম বললেন, এ হার আমি তাকে দিবো, ঘরে যে আমার সবচেয়ে প্রিয়। গৃহের মহিলারা মনে করলেন যে, তিনি এ হার হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকেই দেবেন। কিন্তু তিনি উমামাহকে নিজের কাছে ডাকলেন এবং স্বয়ং নিজের পবিত্র হাত দিয়ে তার গলায় সে হার পরিয়ে দিলেন। -সিরাতুন্নবী: দ্বিতীয় খণ্ড

তালকীন বা দীক্ষা:

একটি শিশুকে তার মৌলিক জ্ঞান শিখানো সহজ। কারণ তাকে যা শিক্ষা দেয়া হবে তা-ই সে স্মরণ রাখতে পারবে। আর যখন কোন বিদ্যা উত্তমরূপে শিখানো হবে সেটা তার মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হয়ে থাকবে। বহুকাল অতিক্রম হলেও তা আর সে ভুলতে পারবে না। বিশেষত সে বিষয়টি অন্যটার সঙ্গে পুনরাবৃত্তির সময়। অতএব এ সময় শিশুকে কুরআনুল কারীম পাঠ দানের প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান হওয়া উচিত। ছোট সূরাগুলো হেফজ করার মাধ্যমে সূচনা করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে আধুনিক উপকরণের সাহায্য নেয়া যায়। যেমন: ক্যাসেট ও কম্পিউটার ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে। এ সময় শিশুকে আকীদা-বিশ্বাস, দোয়া ও আদাব বিষয়ক অনতিদীর্ঘ হাদীসগুলোও শিক্ষা দিতে হবে।

সমাজে এমন অনেক পরিবার দেখা যায়, যারা লেখা পড়া অথবা অন্য কোন বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিশুকে একেবারে ছোট্টবয়সে তথাকথিত কিন্ডারগার্টেনে নিয়ে যায়। যদিও এক্ষেত্রে দু-একটা উপকারিতা যে কখনো পরিলক্ষিত হয় না; তা নয়। তবে এখানে ক্ষতির পরিমাণটা এত বড় যে, উপকারিতার সাথে তার কোন তুলনা চলে না। কারণ এতে একটি শিশুকে তার ভিত্তিমূল প্রতিপালন আলয় থেকে টেনে আনা হয়। ফলশ্রুতিতে শিশু একেবারে অল্প বয়সে সাধারত ৩ বছর বয়সে তার স্বভাবজাত প্রকৃতি, মা ও তার স্নেহসুলভ পরিচর্যা থেকে দূরে সরে যায়। তখন শিশুর পরিচর্যা নিজ গৃহে পূর্ণ হওয়ার পূর্বে বহিরাগত প্রভাব তার পরিচর্যার ক্ষেত্রে ত্বরান্বিত হয়। ফলশ্রুতিতে কিন্ডারগার্টেনের পরিবেশ এবং গৃহে শিশুর প্রতিপালনের মধ্যে একটা সাংঘর্ষিক অবস্থার সৃষ্টি হয়। বিশেষত পাশ্চাত্য শিক্ষার দূষিত বায়ু প্রবাহের পর। যদ্বারা এমন অপসংস্কৃতির সয়লাব ও সামাজিক অবক্ষয়ের প্রসার ঘটে- যা অনেক দিক থেকে বিশেষ করে শিক্ষা কারিকুলামের দিক থেকে আমাদের ইসলামী সমাজের বিরোধী। তবে কখনো বা নেহায়েত প্রয়োজনে পরিস্থিতির শিকার হয়ে একটি পরিবার বাধ্য হয়ে এমনটি করে থাকে। যেমন: মা ঘরের বাইরে চাকুরী করেন। সাংসারিক প্রয়োজন মেটাতে হলে তার এছাড়া অন্য কোন উপায়ও নেই। এহেন পরিস্থিতে অভিভাবকের কর্তব্য হবে, এমন একটি কিন্ডারগার্টেন খুঁজে নেওয়া যেখানে থাকবে সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে তার আশা-আকাংক্ষার বাস্তব প্রতিফলন। যদিও সে প্রতিষ্ঠানটির

শিক্ষাগত মান সর্বোচ্চ পর্যায়ের বা উঁচু মানের না-ও হয়। এ অবস্থায়ও শিক্ষাগত দিকটাকে প্রতিপালনের বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দেয়া উচিত হবে না।
সন্তানের শিক্ষার তো অনেক ব্যবস্থা আছে। কিন্তু দীক্ষাটা হবে কীভাবে? শিক্ষা দেবার জন্য অনেকে আছে। কিন্তু দীক্ষার জন্য আসলেই আপনি ছাড়া আর কেউ নেই, খেয়াল করে দেখুন।সন্তানের জন্য শ্রেষ্ঠ শিক্ষা হলো, যা তার বাবা তাকে দেয়। এখন স্কুলে না দিয়ে আপনি নিজে তাকে সময় দিন, নিজে শেখান। স্কুল তাকে ওই জিনিস শেখাবে না, যা আপনি তাকে শেখাবেন। আর যা তাকে আপনি এখন শেখাবেন সেটাই সে সারাজীবন লালন করবে, সেটাই তার ব্যক্তিত্ব গঠন করবে, সেটাই হবে 'সে'।
জাবির ইবনু সামুরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, নিজের সন্তানকে শিষ্টাচার ও আদব-কায়দা শিক্ষা দেওয়া এক 'সা' পরিমাণ বস্তু দান-খাইরাত করার চেয়েও উত্তম।

আইউব রহ. আপন পিতা থেকে, তিনি আপন দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, কোনো পিতা আপন সন্তানদেরকে উত্তম শিক্ষা ও আদব দান করার চেয়ে উত্তম কোনো উপহার দেয়নি।
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপন নাবালক চাচাতো ভাই আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-কে আকীদা শেখাচ্ছেন:

.হে বালক, আল্লাহকে হেফাজত করো, তা হলে আল্লাহ তোমাকে হেফাজত করবেন।

.আল্লাহকে হেফাজত করো, তা হলে তাঁকে তোমার সাথেই পাবে।

.স্বাচ্ছন্দ্যের সময় আল্লাহকে চেনো, তা হলে বিপদের সময় তিনি তোমাকে চিনবেন।

.যখন কিছু চাইবে, আল্লাহর কাছেই চাইবে।

.যখন সাহায্য লাগবে, আল্লাহর দিকেই ফিরবে।

.যা যা ঘটবে, তা লেখার পর কলমের কালি শুকিয়ে গেছে।

.সমগ্র সৃষ্টিজগত যদি একত্র হয়ে তোমার এমন কোনো উপকার করতে চায়,যা আল্লাহ নির্ধারিত করে রাখেননি, তা হলে তারা তা করতে সমর্থ হবে না।

.আর তারা যদি তোমার এমন কোনো ক্ষতি করতে চায়, যা আল্লাহ নির্ধারণ করেননি, তা হলে তারা সে ক্ষতি করতে পারবে না। জেনে রেখো, অপছন্দনীয় জিনিস ধৈর্যের মাধ্যমে সহ্য করার মাঝে আছে মহাকল্যাণ।

.বিজয় রয়েছে ধৈর্যের মধ্যে; কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বস্তি; আর কঠিন অবস্থার সাথে রয়েছে সহজতা।

কিংবা সূরা লোকমানে বর্ণিত লোকমান হাকিমের উপদেশ সামনে নিয়েও সন্তানকে কোলের মধ্যে করে শেখাতে পারেন:

.হে বৎস, আল্লাহর সাথে শরিক কোরো না। নিশ্চয় আল্লাহর সাথে শরীক করা মহা অন্যায়।

.হে বৎস, কোন বস্তু যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয়, অতঃপর তা যদি থাকে প্রস্তর-গর্ভে অথবা আকাশে অথবা ভূ-গর্ভে, তবে আল্লাহ তাও উপস্থিত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ গোপন ভেদ জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন।

.হে বৎস, নামায কায়েম করো, সৎকাজে আদেশ দাও, মন্দকাজে নিষেধ করো এবং বিপদাপদে সবর করো। নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ।

.অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা কোরো না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে পদচারণ কোরো না। নিশ্চয় আল্লাহ কোনো দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না।

.পদচারণায় মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করো এবং কণ্ঠস্বর নিচু করো। নিঃসন্দেহে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।

সন্তানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

দৈহিক ও শারীরিক প্রবৃদ্ধি ও রক্ষণাবেক্ষণও সন্তানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। কিন্তু এ অধিকার পূরণ সত্ত্বেও আপনি যদি তার শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, শিষ্টাচার ও সভ্যতা থেকে গাফেল থাকেন তাহলে আপনি বড়ো ধরনের অন্যায় করছেন। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ছাড়া আপনার সন্তান সন্তান হতে পারে না। যে সকল পবিত্র আকাঙ্ক্ষা সামনে রেখে সন্তান কামনা করেন এবং যেসব উত্তম আশা পূরণের লক্ষ্যে দিন-রাত তাদের লালন-পালনে সময় ব্যয় করেন তা তখনই পূরণ হতে পারে যখন আপনি সন্তানের দীনি শিক্ষা এবং নৈতিক প্রশিক্ষণের হক আদায় করবেন।

সন্তানকে নেক ও ভাগ্যবান করে গড়ে তোলা একদিকে যেমন আপনার দীনি দায়িত্ব। তেমনি সন্তানের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনও তাদের অধিকারভুক্ত ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে সন্তানের অধিকারসমূহের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হলো, আপনি অত্যন্ত হিকমত, চিন্তা-ভাবনা, ধৈর্য, কর্তব্য সচেতনতা, উদারতা, রুচিশীলতা, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও একাগ্রতার সাথে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবেন। সন্তানের এ অধিকার পূরণ করেই আপনি আশা করতে পারেন যে, আপনার সন্তান আপনার জন্য শান্তির কারণ, সমাজের জন্য রহমাতের মাধ্যম, মিল্লাতের জন্য গৌরবের আধার এবং দীনের সম্পদ হতে পারে। সন্তান লালন-পালনে প্রভূত পরিমাণ জীবনী শক্তি ও সম্পদ ব্যয়ের পরও যদি আপনি তাদের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে গাফলতি প্রদর্শন করেন তাহলে আপনি সাংঘাতিক ধরনের সামাজিক অপরাধ করছেন। এ অপরাধের পরিণামফল অত্যন্ত বিষময়।

শিক্ষা ও প্রশিক্ষনে মায়ের বিষেশ অংশ

সন্তানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে নিসন্দেহে দায়িত্ব শুধু আপনার একার নয়। মাতা-পিতা উভয়েরই দায়িত্ব রয়েছে। মায়ের প্রশিক্ষণের মতো পিতার শিক্ষাও বিশেষ প্রয়োজন। বরং এ ব্যাপারে ব্যয়ের যে সম্পর্ক রয়েছে, ইসলাম তা পুরোপুরি পিতার উপরই বর্তিয়েছে। মা-কে এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু এটাও ঠিক যে, সন্তান

লালন-পালনে মায়ের তৎপরতা বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার। এতে তারই সিংহ ভাগ প্রচেষ্টা থাকে। সন্তানের শারীরিক যত্ন এবং লালন-পালনে মায়ের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা যেমন প্রয়োজন ঠিক তেমনি তার শিক্ষা-দীক্ষাতেও তার বিশেষ অংশ রয়েছে এবং মায়ের প্রশিক্ষণেই শিশু সন্তান সে ধরনের যোগ্য হয়ে উঠে যাতে দেশ ও জাতির সম্মান বৃদ্ধি পায়। সাথে সাথে মাতা-পিতারও সুখ সৌভাগ্য ঘটে।

পিতা আয়-উপার্জনের লক্ষ্যে এবং জীবনের প্রয়োজন পূরণার্থে বেশীর ভাগ সময়ই ব্যস্ত থাকেন। সে জন্য তিনি অধিকাংশ সময় সন্তানদের সাথে সম্পর্কহীন অবস্থায় কাটান। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সন্তানদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে যথাযথ মনোযোগ দেয়ার সুযোগ পান না। প্রকৃতিগতভাবেই মা এ ব্যাপারে বেশী বেশী সুযোগ লাভ করে থাকেন। সাধারণত তিনি সবসময় সন্তানদের সাথে থাকেন। সন্তানদের পুরো জীবন এবং তাদের ব্যক্তিত্বের প্রতিটি দিকই তার সামনে থাকে। সবসময় সাথে থাকার কারণে শিশুরা মায়ের ভীতিতে ভোগে না। অসাধারণ নরম মেজাজ, ধৈর্য এবং নজিরবিহীন আপত্য স্নেহের কারণে শিশুরা মায়ের প্রতি ভীতিহীন ও অনুগত হয়ে থাকে। নির্ভয় ও স্বাধীনভাবে মায়ের নিকট সব ধরনের দাবী-দাওয়া, প্রতিবাদ এবং দুষ্টমি করে। এভাবে তাদের সকল যোগ্যতা ও ভালো-মন্দ শক্তি প্রকাশিত হয়। এতে তাদের সংশোধন ও প্রশিক্ষণের কাজ সহজেই করা সম্ভব। তবুও প্রশিক্ষণ ও সংশোধনের জন্য যে ধৈর্য, ত্যাগ, উদারতা, স্নেহ-ভালোবাসা এবং নৈতিক গুণাবলী প্রয়োজন তা আল্লাহ পাক পিতার তুলনায় মাতাকেই বেশী দান করেছেন। পিতা খুব তাড়াতাড়ি অধৈর্য ও ক্রোধ প্রকাশ করতে থাকে। কিন্তু মাতা শেষ পর্যন্ত ধৈর্য, দয়া, স্নেহ ও সুন্দর আচরণ করে থাকেন এবং শিশুদের আভ্যন্তরীণ অনুভূতি জাগ্রত করার ব্যাপারে বেশী সফল হয়ে থাকেন। সন্তানের ভুল-ভ্রান্তিতে ক্রোধান্বিত হয়ে পিতা অসন্তুষ্ট ও সম্পর্কহীনতার কথা ঘোষণা করে বসে। পক্ষান্তরে মা সন্তানকে বুকে লাগিয়ে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার সংশোধন এবং মর্যাদাপূর্ণ করে তোলার জন্য অন্তর দিয়ে একাগ্রচিত্তে চেষ্টা চালিয়ে থাকেন।

দীনে সন্তানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের স্থান

সন্তানের জীবনকে সফল বানানোর জন্য প্রয়োজন হলো আপনাকে সন্তানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যাপারে অসাধারণ মনোযোগ দিতে হবে। চরম হিকমত, একান্ত আন্তরিক

প্রচেষ্টা, ধৈর্য ও স্থৈর্যের দৃষ্টিতে যেমন সমাজের দৃষ্টিতেও তেমনি মর্যাদাকর। এর বদৌলতে আপনি দুনিয়াতেও মান-মর্যাদা ও সুনাম পাবেন এবং আখেরাতেও মান-মর্যাদার অধিকারী হবেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টিতে সন্তানের জন্য সবচেয়ে উত্তম তোহফা হলো আপনি তাকে উত্তম শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে সুসজ্জিত করবেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ

مَا نَحِلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ-

"পিতা নিজের সন্তানকে যাকিছু প্রদান করেন তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হলো ভালো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ।”

সন্তানের ভালো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সাদকায়ে জারিয়া। আপনার কাজের সময় ও সুযোগ শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আপনার আমলনামায় পুরস্কার ও সওয়াব বৃদ্ধি পেতে থাকবে। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُولَه- ُ

"যখন মানুষ মরে যায়, তখন তার আমলের প্রসঙ্গ শেষ হয়ে যায়।কিন্তু তিন বিষয়ের সওয়াব ও পুরস্কার মৃত্যুর পরও পেতে থাকে। প্রথম, সে কোনো সাদকায়ে জারিয়া করে গিয়ে থাকলে; দুই, এমন কোনো জ্ঞান যা থেকে জনগণ উপকৃত হতে থাকে; তিন, নেক পুত্র তার জন্য দোয়া করে।"

একবার রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কুরআনের আলেমের মাতা-পিতাকে কিয়ামতের দিন টুপি পরানো হবে।
তিনি ইরশাদ করেছেন:

مَنْ قَرَءَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِهِ الْبِسَ وَالِدَهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيمَةِ ضَوْءُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضوء الشَّمْسِ فِي بُيُوتِ الدُّنْيَا فَمَا ظَنَّكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ بِهَذَا - ابو داود، حاكم

"যে কুরআনের জ্ঞান হাসিল করলো এবং তার উপর আমলও করলো তার মাতা-পিতাকে কিয়ামতের দিন টুপি পরানো হবে। যার আলো সে সূর্যের আলোর চেয়ে বেশী উত্তম হবে যে সূর্য দুনিয়ার ঘরগুলোকে আলোকিত করে থাকে। তাহলে যারা আমল করেছে তাদের ব্যাপারে তোমাদের ধারণা কি তা বলো।"-আবু দাউদ, হাকেম

হযরত বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাওয়ায়েতে টুপির পরিবর্তে জান্নাতের পোশাকের উল্লেখ রয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

"যে ব্যক্তি কুরআন পড়লো, শিখলো এবং তার উপর আমল করলো কিয়ামতের দিন তার মাতা-পিতাকে নূরানী টুপি পরিধান করানো হবে।সূর্যের আলোর মতো তার আলো হবে এবং তার মাতা-পিতাকে এমন মূল্যবান দুটি পোশাক পরানো হবে যার মূল্য সমগ্র দুনিয়াও হতে পারবে না। তখন মাতা-পিতা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করবেন, এ পোশাক তাদেরকে কিসের বিনিময়ে পরিধান করানো হচ্ছে। তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের পুত্রের কুরআন হাসিলের বিনিময়ে এটা পরিধান করানো হচ্ছে।”

এসব বর্ণনায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্তান প্রশিক্ষণের অপরিসীম সওয়াব ও পুরস্কারের কথা বর্ণনা করে উম্মাতকে এ দায়িত্বের প্রশ্নে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আর এ উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্য হলো, উম্মাতের কোনো গৃহই যাতে সন্তানের শিক্ষা-প্রশিক্ষণের ব্যাপারে অবহেলা করা না হয়। উদ্বুদ্ধ করণের সাথে সাথে তিনি এও আলোকপাত করেছেন যে, যে সকল মাতা-পিতা এ দায়িত্ব পালনে অবহেলা প্রদর্শন করবে তাদেরকে কিয়ামতের দিন কঠোরভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

সন্তানের বিয়ে

শিশু যেই যৌবনে পদার্পণ করে তখনই সে নতুন ধরনের চিন্তা, আকাঙ্ক্ষা এবং পেরেশানীতে নিপতিত হয়। সন্তান যখন বয়সের এ পর্যায়ে উপনীত হয় তখন মাতা-পিতা নতুন ধরনের আবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠেন। যখন ভবিষ্যতের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করেন তখন ভয়-ভীতি ও সংশয় তাদের আরামকে নষ্ট করে দেয়। কখনো

ভবিষ্যতের সুন্দর আশা-আকাঙ্ক্ষার চিন্তায় তাদের আনন্দের সীমা-পরিসীমা থাকে না। কখনো অমূলক পেরেশানী এবং কল্পনাপ্রসূত জটিলতায় অন্তর ছোট হয়ে যায়। কখনো দায়িত্বানুভূতি তাদেরকে উত্তেজিত করে এবং অবিলম্বে সন্তানের এ দায়িত্ব থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠে। সুন্দরী ও ভদ্র পুত্রবধূ গৃহে আনার আনন্দে তাদের অন্তর কখনো আত্মহারা হয়ে উঠে। কখনো কন্যার জন্য নেকবখত ও নেক চরিত্রের জীবন সাথী পাবার ব্যাপারে আল্লাহর নিকট কেঁদে কেঁদে মুনাজাত করে থাকেন।

সন্তানকে বিয়ে দেয়া একদিকে যেমন সামাজিক কর্তব্য। তেমনি এটা মাতা-পিতারও আন্তরিক কামনা এবং ইসলামও এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ ও হেদায়াত দিয়ে থাকে।

বিলম্বে বিয়ের খারাপ পরিণাম

পুত্র হোক অথবা কন্যা যখনই সে জওয়ান হয়, তখনই তার যথাযথ সম্পর্ক স্থাপনের চিন্তা করা মাতা-পিতার অন্যতম গুরত্বপূর্ণ কর্তব্য। আর যখনই এ ধরনের সম্পর্ক পাওয়া যাবে তৎক্ষণাৎ তাকে বিয়ের বাকডোরে বেঁধে দেয়া উচিত। বিয়ের ব্যাপারেত অহেতুক বিলম্ব করা অনেক সময় খুব লজ্জাকর পরিণাম ডেকে আনে। সমাজের মানুষকে মুখ দেখানোর যোগ্য থাকে না। এ লজ্জা মাতা-পিতার জীবনে গ্লানিকর হয়ে উঠে। কিন্তু এর দায়-দায়িত্ব মাতা-পিতার উপরও বর্তায়। কেননা তারা সন্তানের বিয়ে দেয়ার ব্যাপারে অলসতা দেখিয়ে থাকে অথবা কোনো শরয়ী ও যুক্তিপূর্ণ কারণ ছাড়া বিলম্ব করে। যৌবনের আবেগ বা উত্তেজনা প্রশমনের সঠিক স্থান না পেলে যুবকদের বিপথে পরিচালিত হবার সমূহ আশংকা থাকে। আর এ জন্যে আপনি খারাপ পরিবেশের দোহাই দিয়ে নিজেকে নিষ্পাপ প্রমাণ করবেন অথবা যুবকদের গালমন্দ দিয়ে নিজেদের অপরাধ তা থেকে বাচার

নিষ্ফল চেষ্টা চালাবেন তা হতে পারে না। এ রোগের সঠিক সমাধান হলো, আপনি আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য অনুভব করুন এবং এ পর্যায়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে হেদায়াত দিয়েছেন তা অত্যন্ত গুরুত্ব ও মনোযোগের সাথে পালন করুন। বিলম্বে বিয়ের পরিণাম শুধু উদ্ভূত খারাপ পরিস্থিতিই নয়, বরং ইসলামের

পরিণাম দৃষ্টিতে আপনি গুনাহগার হিসেবে বিবেচিত হবেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ

مَنْ وَلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَلْيُحْسِنْ اسْمُهُ وَأَدبَّهُ فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجُهُ وَإِنْ بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجُهُ فَأَصَابَ إِثْمًا فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى أَبِيهِ - بيهقى

"আল্লাহ যাকে সন্তান দান করেছেন তার কাজ হলো, তার ভালো নাম রাখা, তাকে ভালোভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া এবং যখন সে বালেগ হবে তখন তার বিয়ে দিয়ে দেয়া। বালেগ হবার পর সে সন্তানের বিয়ে না দেয় এবং কোনো গুনাহতে লিপ্ত হয় তাহলে তার শাস্তি পিতার উপর আরোপিত হবে।"-বায়হাকী

অন্য এক স্থানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তাওরাতে লিপিবদ্ধ আছে, "যে ব্যক্তির কন্যার বয়স ১২ বছর হলো এবং সে তার বিয়ে দিলো না এবং সে কোনো খারাপ কাজ করে বসলো তাহলে তার সে খারাপ কাজের শাস্তি পিতার উপর আরোপিত হবে।"

জীবন সঙ্গী নির্বাচনের মাপকাঠি

জীবন সাথী নির্বাচনে সাধারণত পাঁচটি জিনিস সামনে রাখা হয়ে থাকে।

এক: ধন-সম্পদ

দুই: বংশ আভিজাত্য

তিন: সুশ্রী ও সৌন্দর্য

চার: দীন ও আখলাক এবং'

পাঁচ: শিক্ষা।

এটা নিসন্দেহে বলা যায় যে, এ পাঁচটি বস্তু স্ব স্ব স্থানে গুরুত্বপূর্ণ। এ যুগে ধন-সম্পদের গুরুত্ব কে অস্বীকার করতে পারে। বংশ আভিজাত্যও অনেক ক্ষেত্রে উপেক্ষা করার বিষয় নয়।

জীবন সঙ্গীনি নির্বাচনে সৌন্দর্য ও সুশ্রী হওয়াটাও মৌলিক গুরুত্বের দাবীদার। তা পাত্রী নির্বাচনে বিশেষ করে এ বিষয়টি সিদ্ধান্তমূলক হয়ে থাকে। এ ব্যাপারটিও তো অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আল্লাহই মানুষকে রুচি এবং সৌন্দর্য প্রদান করেছেন এবং রূপতো ছেন্দ করারই বিষয়।

শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজন স্বীকৃত সত্য। বর্তমান যুগে সম্বন্ধ স্থাপনে, শিক্ষার এবং ডিগ্রীকে তো বিশেষভাবে খেয়ালে রাখা হয়। এটাও ঠিক যে উচ্চ শিক্ষার উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি করে এবং সভ্যতায় সুসজ্জিত করে। উচ্চ শিক্ষা মান-ইজ্জত বৃদ্ধির মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়। সচ্ছল জীবন এবং সমাজে মান-সম্মানের কারণ হয়।

রইলো দীন ও আখলাকের কথা। এটাতো স্পষ্ট ব্যাপার যে, মুসলমানের নিকট তার গুরুত্ব ও মূল্য থাকবেই। প্রস্তাবিত ব্যক্তির মধ্যে মুসলমান মাতা-পিতা সবকিছু দেখবেন অথচ দীন ও আখলাকের ব্যাপারটি উপেক্ষা করবেন অথবা কোনো গুরুত্বই দেবেন না, তা হতে পারে না।

আপনার আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং চেষ্টা যদি এ হয় যে, আপনার কন্যা অথবা পুত্রকে এমন জীবন সাথী এনে দেবেন যে, এ পাঁচ গুণে গুণান্বিত। আপনার এ আকাঙ্ক্ষা শুভ। আপনার আশাও ঠিক এবং আপনার প্রচেষ্টাও সঠিক। কোন্ পিতা-মাতা চায় না যে, তার কলিজার টুকরা এসব গুণে গুণান্বিত জীবন সাথী লাভ করুক?

ইসলাম আপনার এ আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং চেতনার কখনো অবমূল্যায়ন করে না। ইসলাম আপনার এ আবেগের মর্যাদা দেয়।

সকল গুণে বিভূষিত দম্পতি যদি পান তাহলে তা হবে আল্লাহর বিশেষ অবদান। সাধারণত প্রত্যেক সম্পর্ক স্থাপনে সকল গুণ এক সাথে পাওয়া খুবই দুষ্কর ব্যাপার। কারোর মধ্যে কিছু গুণ পাওয়া গেলে আবার কিছু মন্দও পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারে আপনার পরীক্ষা হলো, নির্বাচনে আপনাকে ইসলামী দৃষ্টিকোণকে সামনে রাখতে হবে এবং ইসলাম এ গুণকে অগ্রাধিকার দিয়েছে তাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে।

শিশুর আনুগত্য ও অনুসরণ:

একটি শিশু তার মা-বাবার আনুগত্যের দিকে ঝুঁকে পড়ে সবচেয়ে বেশি। তবে প্রত্যেকেই তার লিঙ্গ ও জাতের আনুকূল্য বজায় রাখে। সুতরাং স্বভাবত ছেলেকে তার বাবার ও মেয়েকে তার মায়ের আনুগত্য করতে দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে এই বয়সে একটি শিশু-সন্তানের জন্যে তার মা-বাবার সঙ্গে গভীর সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এ বিষয়ে গভীর মনোযোগ প্রদান শিশুর প্রতিপালন ও তার নিরাপত্তা বিধানে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

ভালো কাজ- যার পেছনে কোন বিপদাশঙ্কা নেই তাতে আনুগত্য করায় শিশুর প্রতি কোন নিষেধাজ্ঞাও নেই। এমন কি শিশু নিজে সেটাকে ভালো মনে না করলেও। একটি অবুঝ শিশু যখন তার মাকে ঘরের মধ্যে নামাজ পড়তে দেখে, তখন সে তার অনুকরণ করেতে চেষ্টা করে। এ ক্ষেত্রে তাকে বারণ করা অনুচিত, যদিও এতে তার নামাজের একাগ্রতা বিঘ্নিত হয়ে থাকে অথবা সে এমন কিছু করে ফেলে যা উচিত নয়। বস্তুতঃ এসব করতে ছেড়ে দেয়াই তাকে নামাজে অভ্যস্ত করার অন্যতম উপায়। উপরন্তু সম্ভব হলে তার জন্য একটি ছোট্ট জায়নামাজের ব্যবস্থা করা উত্তম। যাতে নামাজের সময় হলে সে তার মায়ের সঙ্গে নামাজ পড়তে ও নামাজে তার অনুকরণ করতে প্রাণিত হয়।

এমনিভাবে মা-বাবা বা যে কোন একজনের পক্ষ থেকেও মন্দ কাজ অথবা নিন্দিত আচরণ শিশুর সম্মুখে প্রকাশ পাওয়া উচিত নয়। মা-বাবা যে কোন একজনের যদি এ

জাতীয় কর্মের অভ্যাস থেকে থাকে। যেমন: ধূমপান করা, তাহলে তাৎক্ষণিক আল্লাহ তা'আলার নিকট তওবা করা এবং কোন অবস্থাতেই যেন শিশুটি তার এ কাজ দেখতে না পায় সে ব্যবস্থা করা কর্তব্য। যেমন: বিপদজনক কার্যসমূহ; যদিও তা কোন ত্রুটিযুক্ত বা নিষিদ্ধ কাজ নয়, তদুপরি তা একটি শিশুর সম্মুখে করা অনুচিত। কারণ মা-বাবা ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর নির্জনে সে তাদের অনুসরণ করার চেষ্টা করে থাকে। অথচ সে তো এই মুহূর্তেই তার নিরাপদ ব্যবহার-বিধি উত্তমরূপে জেনে নিতে সক্ষম হয়নি। যথা- চুলা ধরানো। পক্ষান্তরে নান্দনিক ও উত্তম আচরণসমূহ শিশুর সম্মুখে বেশি বেশি প্রকাশ করা দরকার। যথা- মা-বাবাকে সম্মান করা, মানবিক প্রয়োজনে যে স্থানটা অপরিচ্ছন্ন হয়ে যায় তা পরিষ্কার করা, গৃহস্থালীর মালামাল পরিষ্কার করা অথবা তার নির্দ্ধারিত স্থানে সেটা রেখে দেওয়া, খাবার গ্রহণের পূর্বে ময়লাযুক্ত হাত পরিষ্কার করা কিংবা খাবারের পূর্বে বিসমিল্লাহ এবং খাবারের শেষে আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করা ইত্যাদি।

শিশুর এবয়সে ভাষাগত দিক থেকে শিশুর বিকাশ সাধনে অভিভাবকের যত্নবান হওয়া উচিত। যা আকর্ষণীয় ঘটনাবলী ও উদ্দীপক গল্পসম্ভার হলেও হতে পারে। যেগুলো একটি শিশু পরম আগ্রহভরে চুপ করে শুনতে থাকে। অতঃপর আশা করা যেতে পারে; অভিভাবক যে ভূমিকাটা পালন করলেন শিশু নিজেও সে দায়িত্বটা পালন করবে এবং তা মনোযোগ সহকারে শুনবে। এভাবে কথা বলার ধারাবাহিকতায় ক্রমান্বয়ে সে অগ্রসর হতে থাকবে।
এ সময় শিশুকে 'করো' এবং 'করিও না' কিংবা আদেশ-নিষেধের পদ্ধতির ওপর তৃপ্ত না থেকে বরং 'নিজেই আদর্শ' এই পদ্ধতিতে শিশু প্রতিপালন করা অধিকতর শ্রেয়। কারণ মডেল বা আদর্শ তার মননে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হয়ে থাকে। বাধ্য-বাধকতা ও বিধি-বিধান-যা একটু কষ্টসাধ্য মনে করলে ছেড়ে দেবে-আরোপের চেয়ে অনুকরণের ক্ষেত্রে বেশি কার্যকর।

আমরা অনেক সময় লক্ষ করি, কন্যা শিশু মাকে দেখে তার অনুকরণ করতে অভ্যস্ত। মা খাবারের পর রান্নাঘরে থালা-বাসন পরিষ্কার করতে ব্যস্ত; তখন দেখি শিশুটিও অনাহুত ভাবেই রান্নাঘরে গিয়ে থালা-বাসন ধৌত করতে উদ্যত হয়।

উল্লেখ্য যে, শিশুর অনুসরণের একটি নেতিবাচক ও বিপদজনক দিকও আছে। বিশেষত শিশু টেলিভিশনের পর্দায় যা দেখে তাৎক্ষণিকভাবে তার অনুশীলনের দিকে সে ঝুঁকে পড়ে।

শিশুদের জন্য নির্মিত বাজে ফিল্ম দেখলে তখন বিপদটা প্রকট হয়ে উঠে। যেখানে সে দেখতে পায় মানুষ বাতাসে উড়ছে। তখন এটার অনুশীলন করতে গিয়ে তো নিজেকে নির্ঘাত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারে। এমনিভাবে কোন কোন দৃশ্যের ভয়াবহতা, নারী-পুরুষ সম্পর্কের কু-রুচিপূর্ণ ও অবাঞ্চিত আচরণ তো রয়েছেই। যা দেখে সে তার সমবয়সী বোনের সঙ্গে বা ভাইয়ের সাথে অনুরূপ আচরণ করতে প্রয়াস পাবে। অথচ এর ধ্বংসাত্মক পরিণতি সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে একজন অভিভাবকের পূর্ব থেকেই খুব সতর্ক থাকতে হবে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য অবসর কিংবা কিছুটা সময় বিশ্রামের প্রতি তাকে উৎসাহিত করতে হবে। সাথে সাথে টিভির পর্দায় দৃশ্যমান অনুষ্ঠানমালা দেখার ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণও গ্রহণ করতে হবে। এ আশায় যে, এক পর্যায় এর প্রতি নিরুৎসাহিত হয়ে টিভি দেখার প্রতি আকর্ষণ শেষ হয়ে যাবে।

সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যত

সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যত কেনা চায়। এটা একটা স্বভাবজাত আকাঙ্ক্ষা। আল্লাহ এ আশা ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যে প্রচণ্ড শক্তি ও আকর্ষণ সৃষ্টি করেছেন। মাতা-পিতা এ ব্যাপারে বিশেষ করে একটু বেশী চিন্তাশীল, অনুভূতি প্রবণ এবং তৎপর হয়ে থাকেন। দুনিয়ার নানা ব্যস্ততা সত্ত্বেও মাতা-পিতা কখনো এ চিন্তা মুক্ত হন না, বরং তাদের বেশীর ভাগ চিন্তা ও প্রচেষ্টা এ লক্ষ্যে পরিচালিত হয় যে, তাদের সন্তানের ভবিষ্যত যেন শানদার হয়। আর সন্তানের ভবিষ্যত সম্পর্কে উদ্বিগ্ন নন এমন মাতা-পিতা সম্ভবত খুব কমই আছেন।

সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষা খুবই পসন্দনীয় আকাঙ্ক্ষা। জ্ঞান ও বুদ্ধির দৃষ্টিতে, সমাজের দৃষ্টিতে এবং দীনের দৃষ্টিতে এটা খুবই উন্নত আকাঙ্ক্ষা হিসেবে পরিগণিত। বরং ইসলাম তো এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধই করে থাকে। মুমিন মাতা-পিতাকে

তাকিদই দিয়ে থাকে যে, সে যেন নিজের সন্তানের ভবিষ্যতকে সুন্দর ও উজ্জ্বল করে গড়ে তোলে।

ইসলামের দৃষ্টিতে উজ্জ্বল ভবিষ্যত

ইসলামের দৃষ্টিতে সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যত কি? এ প্রশ্নের সঠিক জবাব পেতে হলে একটি আনুসঙ্গিক প্রশ্ন সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। প্রশ্নটি হলো মুসলমান মাতা-পিতা সন্তানের আকাঙ্ক্ষা কেন করে থাকেন? অন্যান্য মাতা-পিতার সাথে তাদের আকাঙ্ক্ষার পার্থক্য কোথায়? এ তাৎপর্যকে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য আমাদেরকে হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম সম্পর্কিত পবিত্র কুরআনের আয়াত বুঝতে হবে:

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنَى وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنُ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَلِى مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا مريم٦٤ :

"হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম বললেন, হে আমার রব! আমার অস্থি মজ্জা পর্যন্ত গলে গেছে। আর মাথা বার্ধক্য চিহ্নে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দোয়া করে কখনও
ব্যর্থকাম হইনি। আমার পরে আমার ভাই-বন্ধুদের দুষ্কৃতির ভয় রয়েছে আমার মনে। আর আমার স্ত্রী হচ্ছে বন্ধ্যা। তুমি তোমার বিশেষ অনুগ্রহে আমাকে এক উত্তরাধিকারী দান করো। যে আমার উত্তরাধিকারীও হবে। আর ইয়াকুব বংশের মীরাসও লাভ করবে। আর হে রব! তাকে একজন পসন্দ সই মানুষ বানাও।"-সূরা মরিয়ম : ৪-৬

হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম এবং তার স্ত্রী আল ইয়াশবা উভয়েই বয়সের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলো এবং তাদের কর্মশক্তি জবাব দিয়েছিল। এ অবস্থায় হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম এ ভেবে মনে কষ্ট পাচ্ছিলেন যে, তার পরে তার মিশনের ঝাণ্ডাবাহী কে হবে? এবং আল্লাহর দীনের হেফাজত ও প্রচারের দায়িত্ব কে আনজাম দেবে। তিনি দেখছিলেন যে, নবী বংশের যুবকেরা ধর্মদ্রোহী ও দায়িত্বহীন। একত এমন নেই যে, হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালামের উত্তরাধিকার হতে পারে। তিনি এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে অবনত মস্তকে আল্লাহর নিকট দোয়া করতেন।

"পরওয়ারদিগার! আমাকে একজন উত্তরাধিকার দান করো। যে আমার ও আলে ইয়াকুব আলাইহিস সালামের মিরাছের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। হে আমার রব! তাকে তোমার পসন্দনীয় বান্দা বানিও।" হযরত যাকারিয়া আলাইহিস সালাম নিজের বংশ ধারা বাকী রাখার জন্য সন্তানের আকাঙ্ক্ষা করেননি। তার ধন-সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার জন্যও সন্তান কামনা করেননি। বরং তারপর দীনের দায়িত্ব গ্রহণ এবং তার যথার্থ উত্তরাধিকার ও আল্লাহর পসন্দনীয় বান্দা হবার জন্য সন্তান কামনা করেছিলেন।

মু'মিন পিতার অন্তরের গভীর তলদেশ থেকে উত্থিত এ দোয়া আল্লাহ পাক কবুল করেছিলেন এবং তাঁকে এমন এক নেক্কার পুত্র দান করেছিলেন যার শানদার ভবিষ্যত সম্পর্কে আল্লাহর কিতাবেই সাক্ষী রয়েছে:

راتينهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا (وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكُوةً ، وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ

وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا مريم١٢-١٤ :

"আমরা তাকে বাল্যকাল থেকেই 'হুকুম' দ্বারা ধন্য করেছি এবং নিজের নিকট থেকে তাকে নম্র মন ও পবিত্রতা দান করেছি আর সে বড়ো পরহেজগার এবং তার মাতা-পিতার অধিকার রক্ষাকারী ছিল। সে না ছিল অহংকারী-অত্যাচারী, আর না নাফরমান।"

সফল ভবিষ্যতের চিত্র এঁকে পবিত্র কুরআনে এখানে হযরত ইয়াহিয়া আলাইহিস সালামের চরিত্রের কতিপয় বিশেষ গুণাবলীর উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

হুকুম, নরম অন্তর, পবিত্রতা, মুত্তাকিয়ানাহ জীবন, মাতা-পিতার অধিকার সংরক্ষণকারী এবং বিদ্রোহ ও নাফরমানী থেকে পবিত্র জীবন।

হুকুমের অর্থ হলো সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের শক্তি। দীন ও দুনিয়ার ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার যোগ্যতা খুবই পসন্দনীয় এবং ভালো গুণ।

নরম অন্তর শুধু একটি গুণই নয়। বরং অনেক নৈতিক গুণের ভিত্তি।

পবিত্রতা অর্থাৎ গুনাহ, শরমহীনতা, বিপথগামী এবং যুলুম-নির্যাতন থেকে তাঁর নফস পবিত্র ছিল। নফসের পবিত্রতা উঁচু ধরনের নৈতিক মর্যাদা।

তাকওয়া, আল্লাহভীতি এবং পরহেজগারীর জীবনই সফল জীবন। আর একজন মুত্তাকী মানুষই আল্লাহর দৃষ্টিতে ইজ্জত ও মর্যাদার দাবীদার হতে পারে।

মাতা-পিতার অধিকার সংরক্ষণ সে সম্পদ যা সমাজ জীবনে সফল অধিকার আদায়ের জন্য মানুষকে প্রস্তুত রাখে। মাতা-পিতার চক্ষুর আলো এবং অন্তরের শান্তি সে সন্তানই দিতে পারে যে অনুগত, খিদমতগুজার এবং তাদের অধিকার সংরক্ষণকারী। তারা বিদ্রোহীও নয় এবং নাফরমানও নয়।

পবিত্র কুরআনের এ বর্ণনাকে সামনে রেখে পর্যালোচনা করে দেখুন আপনি কি চান। আপনার আকাঙ্ক্ষা কি। আপনি আপনার রবের নিকট কি আশা এবং দোয়া করে থাকেন। আপনার দৃষ্টিতে সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের নকশা কি। সে নকশার সাথে কুরআনের এ নকশার কতটুকু মিল রয়েছে। আর এজন্য আপনার চেষ্টাইবা কি?

উজ্জ্বল ভবিষ্যত লাভ শুধু এ নয় যে, আপনার সন্তান সচ্ছল হবে। তারা উঁচু ডিগ্রীধারী এবং বড়ো বড়ো পদ লাভ করবে। আরাম-আয়েশের সকল বস্তু তাদের নিকট থাকবে। দুনিয়ার মান-মর্যাদা এবং ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি হবে। প্রাসাদোপম অট্টালিকা এবং উন্নত ধরনের গাড়ী থাকবে। আপনি আপনার সন্তানের জন্য এসব আকাঙ্ক্ষা করবেন, অথবা তা হাসিলের জন্য সাহায্য করবেন, ইসলাম তাতে বাধা দেয় না। অবশ্য ইসলাম আপনার মস্তিষ্কের এ প্রশিক্ষণ দিতে চায় যে, আপনার দৃষ্টি যেন শুধু এসব বস্তুতেই সীমাবদ্ধ না থাকে এবং আপনি যেন এসব বস্তুকেই উজ্জ্বল ভবিষ্যত লাভ মনে করতে না থাকেন।

আপনার এ আশা অপসন্দনীয় নয় যে, আপনার সন্তান উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হোক, উঁচু পদ লাভ করুক, আরাম-আয়েশের সম্মান লাভ করুক এবং বস্তুগত দিক থেকে সফল

হোক। এ সবের জন্যও আপনার চেষ্টা অপসন্দনীয় নয়। অপসন্দনীয় হলো, এ দুনিয়া বা বস্তুগত সাফল্যকেই আপনার জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে নেয়া এবং সন্তানের দীন ও আখলাক থেকে গাফেল হয়ে যাওয়া। মুসলমান মা কোনো সময়ই এ সত্যকে যেন মস্তিষ্ক থেকে বের করে না দেন যে, প্রকৃত জীবন হলো আখেরাতের জীবন এবং ঈমান থেকে গাফেল থেকে সে জীবন লাভ কখনোই সম্ভব নয়। আপনার সন্তানের শানদার ভবিষ্যত হলো সে দীনি শিক্ষায় সজ্জিত হোক। দীনের ব্যাপারে তারা গভীরতা লাভ করুক। তারা পবিত্র চরিত্র এবং ইসলামী সভ্যতার প্রতিনিধি হোক। সামাজিক দায়িত্ব পালনে তারা অগ্রগণ্য হোক। তাদের জীবন পবিত্র, আল্লাহভীতি এবং পরহেজগারীর নমুনা হোক। মাতা-পিতার অনুগত ও খিদমত গুজার হোক। বস্তুগত জীবনের উঁচু উঁচু পদে সমাসীন থেকেও দীনে হকের সত্য প্রতিনিধি এবং অকপট খাদেম হোক।

উপসংহার

কুরআন ও হাদীছ থেকে আমরা জানতে পারি যে, পিতা-মাতার মর্যাদা অতুলনীয়। তাদের একটি দীর্ঘশ্বাসের প্রতিদান দেওয়ার ক্ষমতা কোন সন্তানের নেই। অথচ অনেক সন্তান তার বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসে। কেউবা পিতা-মাতাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। আবার কেউ নেশাগ্রস্থ হয়ে তাদের হত্যা করে। কেউ আবার মাকে বেধে রেখে আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে হত্যা করছে, যা পুরো মানব জাতিকে কলঙ্কিত করছে। কিন্তু ইসলামে পিতা-মাতার মর্যাদা অনেক উচু স্থানে অধিষ্ঠিত। যে পিতা-মাতার কারণে একজন সন্তান পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয়, সেই পিতা মাতাকে যারা বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসে, আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারে বা হত্যা করে তারা আর যাই হোক মানবিক বোধ সম্পন্ন নয়। যাদের হৃদয় আছে কিন্তু বুঝে না। চোখ আছে কিন্তু দেখে না। কান আছে কিন্তু শোনে না। ওরা হ'ল চতুষ্পদ জন্তুর মত, বরং তার চাইতে পথভ্রষ্ট। ওরা হ'ল উদাসীন। তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী (আ'রাফ ৭/১৭৯)। আল্লাহ বলেন, 'তুমি কি মনে কর ওদের অধিকাংশ শোনে ও বোঝে? তারা তো চতুষ্পদ জন্তুর মত। বরং তার চাইতে পথভ্রষ্ট' (ফুরক্বান ২৫/৪৪)। সর্বাবস্থায় পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করতে হবে। অন্যথা দুনিয়ায় অশান্তি ও পরকালে শাস্তি ভোগ করতে হবে। পিতা-মাতাকে শারীরিক, মানসিক ও আর্থিকভাবে চিন্তামুক্ত রাখতে হবে। পিতা-মাতার কষ্ট

পাওয়া সন্তানের জন্য বদদো'আ তুল্য। সেজন্য কোনভাবেই যেন পিতা-মাতা কষ্ট না পান সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। পিতা-মাতার সাথে সদাচরণের মাধ্যমে তাদের দো'আর আশা করতে হবে। তাদের ভাল দো'আ সন্তানের জন্য অফুরান কল্যাণের কারণ হবে। পিতা-মাতার খিদমত করার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যান দিবেন।

পক্ষান্তরে পিতামাতার দায়িত্ব হল নেক সন্তানের জন্য বেশি বেশি দোয়া করা।সন্তানদের দুনিয়াবি সফলতার চেয়ে আখিরাতকে প্রাধান্য দেওয়া।বর্তমানে সমাজে দেখা যায় আমরা সন্তানের দুনিয়ার কল্যানের চিন্তায় ওর পরকালকে ভুলে যাই।সন্তান পড়াশোনা না করলে বকা দেই কিন্তু নামাজ না পড়লে কিছু বলিনা,কার সাথে মিশছে সেটা দেখার সময় হয়না পিতামাতার কাছে।আমাদের উচিত সন্তানকে ছোট থাকতে এমনভাবে মানুষ করা যাতে তার অন্তরে আল্লাহভীতি থাকে,আর যে সন্তানের অন্তরে আল্লাহভীতি থাকে সে কখনও মা বাবার অবাধ্য হতে পারেনা।আবার অনেক সময় দেখা যায় পিতামাতা সন্তানদের মাঝে সমতা বঝায় রাখতে পারেনা, যা থেকে পারিবারিক কলহের সৃষ্টি হয়।এজন্য পিতামাতার দায়িত্ব সকল সন্তানকে একরকম দেখা।

সুতরাং সন্তানদের উচিত পিতা মাতার বাধ্য হয়ে চলা ,তাদের নাফরমানি না করা,তাদের সেবা যত্ন করা।তেমনিভাবে পিতা মাতার দায়িত্ব সন্তানদের জন্য বেশি বেশি দোয়া করা ।তাদেরকে মুমিন মুত্তাকী হিসেবে গড়ে তোলা,দ্বিনী পরিবেশে মানুষ করা যাতে তাদের দুনিয়া ও আখিরাত কল্যানকর হয়।আল্লাহ আমাদেরকে উত্তম সন্তান ও উত্তম পিতা মাতা হিসেবে কবুল করুন।আমিন।